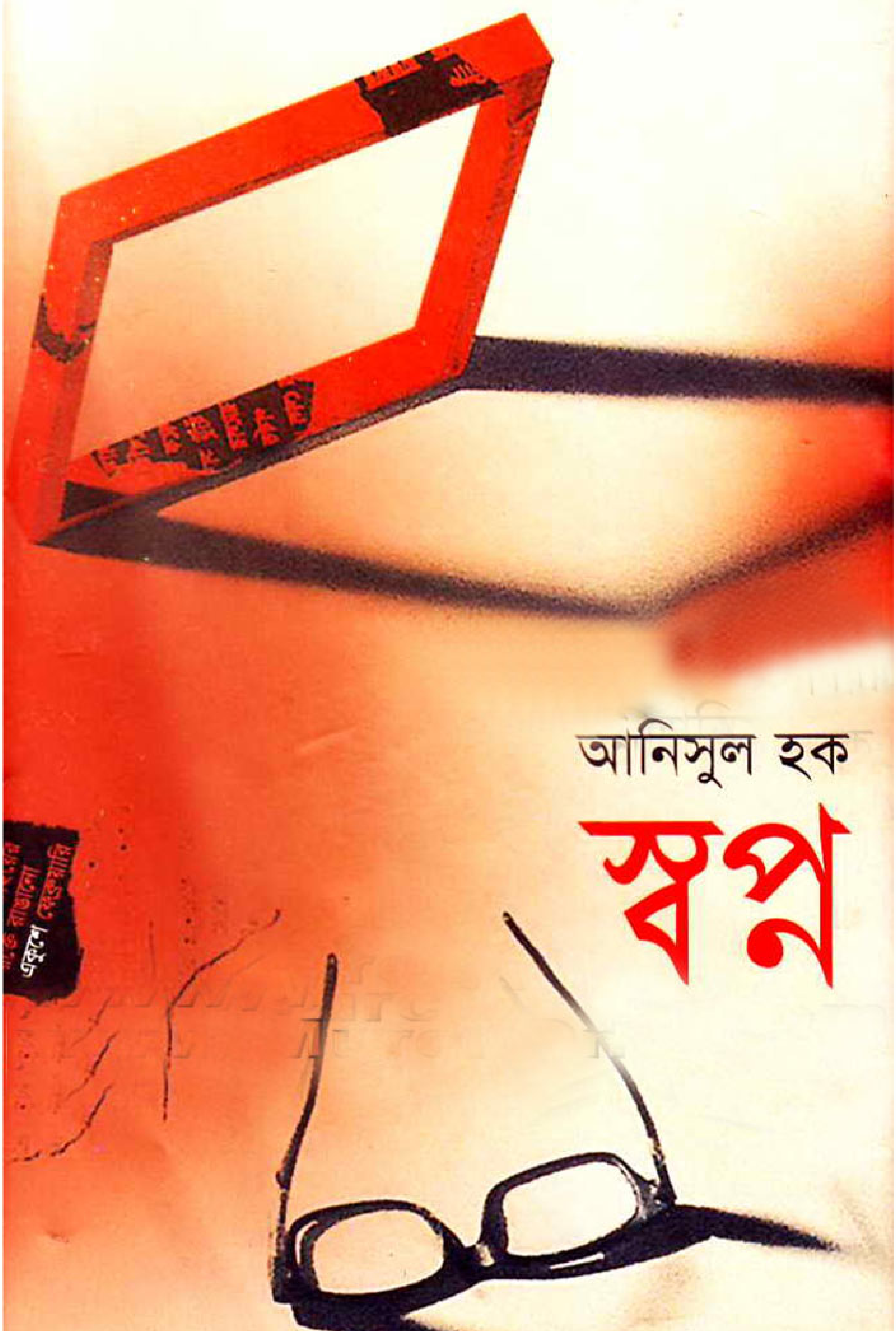

আনিসুল হক
স্বপ্ন

উৎসর্গ

সারা মাহমুদ, শহীদ আলতাফ মাহমুদের সহধর্মিনী
শাওন মাহমুদ, শহীদ আলতাফ মাহমুদের কন্যা

ভূমিকা

এই আখ্যানের একটি চরিত্র শহীদ আলতাফ মাহমুদ, আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের সুরকার, মহান শিল্পী ও যোদ্ধা। আরেকটা চরিত্র শিমূল ইউসুফ, আমাদের দেশের অগ্রগণ্য নাট্যজন।

শিমূল ইউসুফের একটা অসাধারণ লেখা আছে এই বিষয়ে, একজন সাহসী মানুষের মুখ শিরোনামে, প্রকাশিত হয়েছে মতিউর রহমান সম্পাদিত 'আলতাফ মাহমুদ এক ঝড়ের পাখি' গ্রন্থে। শিমূল ইউসুফ অনেক ভালো লেখেন। এই আখ্যানের সংলাপগুলো তাঁর পছন্দ হবে কি হবে না, এই বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। আবার তাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশিত আমার পরিবেশিত মত বা মন্তব্য বা তথ্যের সঙ্গে তিনি একমত নাও হতে পারেন। মনে রাখতে হবে, শিল্পী হিসেবে আমি পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই চরিত্রটি রচনা করেছি। কাজেই এই বইয়ের সমস্ত বাক্যের দায়-দায়িত্ব আমার। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশনের সময়ে সত্যানুগ থাকার চেষ্টা করেছি শতভাগ।

এর আগে মা গ্রন্থ রচনার সময়ও শিমূল ইউসুফ ও নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর যে সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি, তা থেকে বলতে পারি, আমার ভুলত্রুটিও তাঁরা ভালোবাসার সঙ্গেই প্রশ্রয় দেবেন। তাঁদেরকে ভালোবাসা।

আনিসুল হক
জানুয়ারি ২০০৮

১.

পুরানা পল্টনের এই বাড়িটা ৪ তলা। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু আর শিমূল ইউসুফের যৌথ জীবনযাপন এই বাড়িতে। বুদ্ধদেব বসু কথিত সেই পুরানা পল্টন আর নেই, যেখানে শহরের এক প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দু'-একখানা বাড়ি ছিল, যার সম্পর্কে বলা গিয়েছিল, পাকা রাস্তা নেই, ইলেক্ট্রিসিটি নেই।

এখন পুরানা পল্টন ঢাকার আর সব জায়গার মতোই জনবহুল, দালানবহুল, গলি-ঘুপচির ভেতরেও বড় বড় বাড়ি, গ্রিলে ঢাকা বারান্দা, সামনের লোহার গেট যেন বেহুলার বাসরঘর।

এই পুরানা পল্টন লেনে শিমূল ইউসুফদের বাড়িটা যখন ওঠে তখনও চারপাশটা ফাঁকা ফাঁকাই ছিল, পুরোনো কতগুলো বাংলো ধরনে বাড়ি ছিল তখনও, যাদের সামনে ছিল বাগান, কিংবা উঠোন। সেইসব আর নেই। শিমূলদের চোখের সামনেই রাস্তা ঘেঁষে এক ইঞ্চিও জায়গা ছেড়ে না দেওয়া বাড়িগুলো উঠে পাড়াটা ঢাকার আর দশটা পাড়ার মতোই কৌলীন্যহীন হয়ে পড়ল যেন।

চারতলা বাড়িটার ঘরদোরগুলো শিমূল আর বাচ্চু দুজনে মিলে বড় শখ করে সাজিয়েছেন। একটা ঘর আছে, শিমূলের রেওয়াজের ঘর। ঘরের মেঝেতে কাঠ। একপাশে একটা কাঠের মঞ্চ। সেই মঞ্চে বাদ্যযন্ত্রগুলো সাজানো। ঘরের দেয়ালে বড় বড় শিল্পীদের পেইন্টিংস।

বাড়ির ছাদে গাছ আর গাছ। ৩০০ টবে নানা ধরনের গাছ। গোলাপই আছে বিশ ধরনের।

নিচতলায় তাদের নাটকের দলের রিহার্সাল হয় মাঝে-মধ্যে।

শীতের রাত। শিমূল ইউসুফ রাত ১২টার পরে টেলিভিশনে একটা টকশো দেখছিলেন। বাচ্চু ঘুমিয়ে পড়েছেন তাড়াতাড়ি। রাত ১০টার দিকে তিনি ফিরেছেন চট্টগ্রাম থেকে। ওখানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ছিল।

টেলিভিশন টকশোর বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। শিমূল আর চ্যানেল পাল্টাতে পারলেন না। অল্প বয়সী একটা মেয়ে খুব সুন্দর করে কথা বলছে। শিমূল মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগলেন।

হঠাৎ টেলিভিশনের পর্দা ঝিরঝির করতে লাগল।

রিমোটে বোতাম টিপে টেলিভিশনটা অফ করে তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

ঘুম আসতে খানিকটা সময় নিল। টিভিতে তরুণীটি কীভাবে বলছিল, আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জানতে চাই। কিন্তু জানতে পারব কীভাবে? কোনটা বিশ্বাস করব! সেই প্রশ্নটা শিমূলের মাথায় পাক খেতে লাগল। আজকাল প্রায়ই এই রকম হচ্ছে। একটা কথা মাথায় ঢুকলে আর বেরুতে চায় না।

শুধু ওই একটা প্রশ্নই তো নয়। এরপরে আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যেই সরাসরি ফোন এলো একটা। একজন বললেন, আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, এই পরিচয়টা দিতে ভালো লাগে না। মনে হয় বাবা রাজাকার ছিলেন, এটা যদি বলতে পারতাম, আজকে সমাজে মাথা উঁচু করে বেড়াতে পারতাম।

শিমূল ইউসুফের চোখ ফেটে এলো প্রায়। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আজ এই রকম ভাবছে? কেন এই রকম ভাববে সে? তাঁর মাথার মধ্যে টিকটিক শব্দ হতে লাগল।

তার মনে হলো, বাথরুমে কল খোলা, পানি পড়ছে। তিনি উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে দেখলেন কল ঠিক আছে। চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিলেন অনেকক্ষণ ধরে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলেন। ঘরে এসে বেডসাইড টেবিলে রাখা জগ থেকে এক গেলাস পানি ঢেলে নিয়ে খেলেন। তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি, জানেন না। জানার কথাও নয়।

শীতের রাত। ঢাকার শীত তত বিখ্যাত নয়। সন্ধ্যার দিকে বেশ গরমই ছিল আবহাওয়া। শেষ রাতে খানিকটা ঠাণ্ডা পড়লে তিনি পায়ের কাছ থেকে পাতলা কাঁথাটা টেনে নিয়েছিলেন। কী জানি উত্তরের জানালাটা খানিকটা খোলা কিনা! হয়তো উত্তুরে হিমেল হাওয়া ঢুকে পড়ছে জানালার ফাঁক পেয়ে। আর ছাদের গোলাপ গাছগুলো থেকে একটা মিষ্টি সুরভীও যেন আসছে বলে মনে হলো।

তারপর ঘুমটা জমল ভালো।

২.

ঘুম ভাঙল মৃদু ডাকে, শিমূল শিমূল...

শিমূল চোখ কুচকে উঠে পড়লেন। ঘরের জানালা দিয়ে পর্দার ফাঁক গলে বাইরের আবছা আলো উঁকি দিচ্ছে। কামিনী ঝাড়ের মিষ্টি গন্ধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে চারপাশ। চড়ুইপাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে কান পাতলেই। আর কান না পাতলেও ভেসে আসছে কাকের ডাক।

তার মানে ভোর হয়ে গেছে।

আবার অনুচ্চ ডাকটা তার কানে এলো। কে তাঁকে ডাকছে এমন করে! তিনি চোখ মেলে চাইলেন। আশ্চর্য!

তাঁর বিছানার পাশে ঝিলু ভাইয়া!

শিমূলের মাথায় একটা প্রশ্ন আলতোভাবে একবার উদিত হলো কি হলো না যে, ঝিলু ভাইয়া কোত্থেকে আসবেন এতদিন পরে! তিনি তো মারা গেছেন সেই একাত্তরেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আর কোনোদিনও ফিরে আসেননি। শোনা যায়, তাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা নৃশংসভাবে অত্যাচার করে মেরেছিল। তাই এখন তার নামের আগে শহিদ শব্দটা যুক্ত হয়েছে নামের প্রথম অংশের মতো। এখন তিনি শহিদ আলতাফ মাহমুদ।

শহিদ আলতাফ মাহমুদ কোত্থেকে আসবেন এখন। হ্যাঁ, আলতাফ মাহমুদ আসেন বটে এই বাংলায়, যখন ফেব্রুয়ারি আসে এই দেশে, যখন নারীপুরুষ তরুণযুবা ছেলেমেয়ে দল বেঁধে খালি-পায়ে ভোরের কুয়াশা চিরে বেরিয়ে পড়ে আর নীরবতা ভেঙে গেয়ে ওঠে আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। তখন চারপাশের সমস্ত প্রকৃতি মাথা নত করে, চারপাশের গাছগাছালি, দরদালান, এমনকি মেঘ, এমনকি কুয়াশা শোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন সে সবের সঙ্গে মিশে থাকেন আলতাফ মাহমুদ, আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ, একাত্তরের শহিদ আলতাফ মাহমুদ, মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ মাহমুদ। কিন্তু শিমূলের বড়বোন ঝিনুক তথা সারা মাহমুদের বর আলতাফ মাহমুদ, শিমূলের গানের শিক, তথা ভাইয়া ঝিলু তো আর তাদের গার্হস্থ্য জীবনে, আটপৌরে জীবনযাপনের চত্বরে কখনও আসেন না। আসবার কথাও নয়।

শহিদেরা সবার। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক তো কেবল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমিত থাকে!

আলতাফ মাহমুদ বললেন, কীরে শিমূল, এত কী ভাবছিস সাত-পাঁচ! তিনি তার চোখের কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা নেড়ে নাকের ঠিক জায়গাটায় বসালেন যেন!

শিমূল চোখ কুচকে কাঁথাটা গলা পর্যন্ত তুলে বললেন, 'ভাইয়া তুমি!'

'ওঠ। ভোর হয়েছে কখন। রেওয়াজ করবি না?'

শিমূল চোখ রগড়ে বললেন, করব।

'আজকাল তুই রেওয়াজ করা কমিয়ে দিয়েছিস নাকি?'

শিমূল খানিকটা লজ্জা বোধ করলেন। তার মুখের অভিব্যক্তিতে সেটা ধরা পড়ল। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ভাইয়া, রেওয়াজ করি না, তা না। বোঝেনই তো, বয়স হচ্ছে। বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। এখন রাতে ঘুমুতে গেলে ঘুম আসে না। সকালে উঠতে দেরি হয়ে যায়।'

আলতাফ মাহমুদ বললেন, না না। দেরি করে শুতে যাবি না। তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাবি। তাড়াতাড়ি উঠবি।

শিমূল বিছানা থেকে মেঝেতে পা নামিয়ে বললেন, ভাইয়া, আপনি বসেন। আমি চোখেমুখে একটু পানি দিয়ে আসি।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, আয়। তোর সাথে আমিও আজকে হারমোনিয়াম নিয়ে বসব।

শিমূল বলল, সে তো খুব ভালো হবে ভাইয়া।

শিমূল বাথরুমে গেলেন। বেসিনের কল ছাড়লেন। ঠাণ্ডা পানি বেরিয়ে আসছে। তিনি চোখেমুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিলেন।

তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। ঝিলু ভাইয়া কোত্থেকে এলেন।

৩৬টা বছর তাঁর দেখা নেই। এখন তিনি আসবেন কোত্থেকে। ৩৬ বছর আগে এমনি এক ভোরবেলা তিনি বাড়ি থেকে আসি বলে বিদায় নিলেন, তার হাত তখন ছিল পিঠমোড়া করে বাঁধা। অবশ্য এই বাড়ি থেকে নয়। ৭১ সালে তাঁরা থাকতেন রাজারবাগে। সেটা ছিল শিমূলদের বাবার বাড়ি। অর্থাৎ আলতাফ মাহমুদের শ্বশুরবাড়ি। সেই বাড়ি থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। ১৯৭১ সাল। ৩০ শে আগস্ট ভোরবেলা।

সেই একই দিনে আর রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল জাহানারা ইমাম খালাম্মার ছেলে রুমিকে, আর শরিফ ইমামকে, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা বদিকে, আজাদদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আজাদ, জুয়েল,

বাশার প্রমুখকে, আরও অনেককটা মুক্তিযোদ্ধা-নিবাস ঘেরাও করেছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সে এক ভয়ঙ্কর দিন....

চোখমুখ পানিতে ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে শিমূল আবার তার ঘরে ফিরে এলেন। ঝিলু ভাইয়া তেমনি বসে আছেন মেঝেতে। হারমোনিয়ামের ওপরে তার একটা হাত। এই ঘরে হারমোনিয়ামই বা কোত্থেকে এলো। হারমোনিয়াম থাকে পাশের ঘরে। সেটা শিমূলের মিউজিক রুম। কাঠের মঞ্চে সেখানে হারমোনিয়াম তবলা তানপুরা সব সাজানো।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, এক কাপ চা পেলে ভালো হতো।

শিমূল হারমোনিয়ামটার ওপর থেকে ঢাকনাটা সরাতে সরাতে বললেন, দুধ ছাড়া। একটু আদা। একটা তেজপাতা?

আলতাফ মাহমুদ মৃদু হাসলেন, শিমূল তোর মনে আছে?

'কী?'

'এই যে আমি কী রকম করে চা খেতাম?'

'থাকবে না ভাইয়া?'

'অনেকদিন হয়ে গেল না?'

'হুঁ। অনেকদিন। ৩৬ বছর।'

'কী বলিস? ৩৬ বছর। আমি তো তোকে সেই বেনী দোলানো কিশোরীটি রেখে গেছি।'

'ভাইয়া, তোমার বয়স বাড়েনি। কিন্তু আমাদের তো বয়স বেড়ে গেছে। শহিদদের বয়স বাড়ে না। জাহানারা আম্মার ছেলে রুমী। সে অতটুকুনই আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়া। কারণ সে শহিদ। তুমিও সেই রকমই রয়ে গেছ। সেই ৩৯/৪০ বছরের যুবক। কারণ তুমিও শহিদ। আজকে তোমার মেয়ে শাওন ৩৯/৪০-এ পড়ছে।'

'শাওন আমার সমান হয়ে যাচ্ছে! কী আশ্চর্য না!' আলতাফ মাহমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি বিস্মিত হলেন, বোঝা গেল না। শিমূল তাঁর মুখের রেখা পাঠ করার চেষ্টা করলেন। ভেতরের খবর জানা গেল না। কিন্তু বাইরের মানুষটি তেমনি অপূর্ব সুন্দর রয়ে গেছেন। তেমনি উত্তমকুমারের মতো মুখশ্রী, চাঁদপানা মুখ। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। মাপা নাক, মাপা ঠোঁট।

শিমূল বললেন, হবে না কেন ভাইয়া। তুমি যে শহিদ হয়েছ। আমরা তো শহিদ হইনি। আমরা বেঁচে আছি। আমরা বুড়ো হচ্ছি। আমরা ফল পাকার মতো করে একটু একটু করে পুষ্ট হচ্ছি। পেকে গেলেই বোঁটা আলগা হয়ে যাবে। টুপ

করে ঝরে পড়ব। যদি না তারও আগে অপঘাতে কেউ মরে যাই।

'যা অলক্ষুণে কথা বলিস না'--আলতাফ মাহমুদ অনুচ্চস্বরে বললেন।

'কথায় কথায় তোমার চায়ের কথাই গেলাম ভুলে।'

শিমূল উঠলেন। রান্নাঘরে গেলেন। তার এই ঝিলু ভাইয়ার জন্যে একটা সময় তিনি কত চা বানিয়েছেন।

আজ এতদিন পরে তিনি এসেছেন। চা খেতে চেয়েছেন! একটু আদা, একটা তেজপাতা। দুধ ছাড়া।

৩.

শিমূল চা নিয়ে আসেন। আলতাফ মাহমুদ তখন হারমোনিয়ামে সারেগামা বাজাচ্ছেন।

শিমূল চায়ের কাপটা তার পাশে রাখলেন।

আলতাফ মাহমুদ চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে একবার কাচ মুছলেন। তারপর বললেন, তুই কী জানিস আমি হারমোনিয়াম বাজানো জানতাম না!

শিমূল বললেন, না তো! ভাইয়া আমি তো সব সময়েই দেখে এসেছি তুমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারো।

'না না। আমি ঢাকা আসি একটা বেহালা হাতে নিয়ে। বেহালাটা আমি ভালোই বাজাতে পারতাম, মনে হয়!'

'হ্যাঁ বেহালা তুমি ভালো বাজাতে পারতে।'

আলতাফ মাহমুদ হারমোনিয়ামের বোতাম টেনে খুলতে খুলতে বললেন, 'বরিশাল থেকে ঢাকা শহরে আমি এলাম বাক্সবন্দি বেহালা নিয়ে। জুলফিকার আমাকে নিয়ে গেল আর্ট স্কুলে। ধূমকেতু শিল্পী সংঘের নিজামুল হক আর্ট স্কুলের ছাত্র। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জুলফিকার আমাকে! নিজামুল হক আমাকে নিয়ে গেলেন স্কুলের মাঠে। বললেন, বাজাও। আমার তো তখন হাত কাঁপছে! এ যে পরীক্ষা! পরীক্ষায় তো আবার আমি বিশেষ ভালো করি না। কোনো রকমে মেট্রিক পাস! তো বাজালাম। মিয়াকি টৈরি। নিজাম ভাই বুঝলেন। সমঝদার মানুষ। উনি বললেন, ভাই আপনি তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন না।

আমি বললাম, কেন থাকব না কেন?

উনি বললেন, আপনি বড় আর্টিস্ট হবেন। আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

কেন? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

উনি বললেন, কারণ আমরা গান করি মানুষের জন্য। আর তার বদলে টাকাপয়সা পাই না। পাই কেবল মানুষের ভালোবাসা।

আপনারা কি ভাত খান না?

খাই।

তাহলে আমাকেও কিছুটা ভাতের ব্যবস্থা করে দিয়েন। তাহলেই চলবে। আর কিছু চাই না। শোনেন আমি বরিশালে বাটা সু কোম্পানির চাকরি

পেয়েছিলাম। আর বেহালা শিখতাম সুরেন বাবুর কাছে। কিন্তু বরিশালের ছোট গণ্ডিতে তো আমার চলছে না। আমার বড় জায়গা চাই। তাই এই বেহালা আর মায়ের কাঁথাটা সম্বল করে আমি চলে এসেছি।

তিনি বললেন, ঠিক আছে। আজ থেকে তাহলে আপনি আমাদের দলের একজন হয়ে গেলেন। আপনি থাকেন কোথায়।

আমি আবার থাকব কোথায়? জুলফিকারের ওখানে।

উনি বললেন, আমার একটা হোটেল আছে। হারাধনের হোটেল। আ বা ফ্রি মানে আহার বাসস্থান ফ্রি। আপনি সেখানে থাকতে পারেন। একটু কষ্ট হবে।

কষ্ট! এযে মেঘ না চাইতেই জল। আমি উঠব আপনার ওখানে। ব্যাস। আমি নিজামের ওখানে উঠে পড়লাম।'

শিমূল বললেন, 'ভাইয়া তুমি কিন্তু নিজাম ভাইয়াকে দেওয়া সেই কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রেখেছিলে। তুমি কিন্তু বড় শিল্পী হওয়ার ধান্দায় ছিলে না। তুমি ছিলে মানুষের জন্যে গান গাওয়ার দলে। তুমি ছাড়া, তুমি, শেখ লুতফর রহমান, নিজামুল হক--এই রকম মানুষগুলো ছাড়া এই দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হতে পারত না পঞ্চাশের দশকে। তা না হলে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনও হতে পারত না। তাই না! আর জীবনের শেষদিনগুলোও তুমি ঢাকা শহরে কাটালে। এখানে থেকেই আরবান গেরিলাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলে। তোমার ভারতে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গেলে না। তার আগেই তুমি ধরা পড়লে।'

'তুই বোধ হয় বাড়িয়ে বলছিস শিমূল।' আলতাফ মাহমুদ বিব্রত হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন।

'মোটেও বাড়িয়ে বলছি না ভাইয়া। আচ্ছা তোমার গল্পটা তুমি বলতে থাকো। তুমি যে বেহালা হাতে বরিশাল থেকে চলে এলে সেটা কত সালের দিকে!' শিমূল প্রশ্ন করলেন।

'১৯৫০ হবে!'

'তখনই তুমি বেহালা ভালো বাজাতে!'

'হুঁ।'

শিমূল বললেন, 'নিজাম ভাইয়া তোমাকে খুব ভালোবেসেছিলেন। বছর আটেক আগে শিল্পকলা একাডেমিতে তোমার একটা স্মরণসভা হয়েছিল। সেখানে নিজাম ভাই বলছিলেন, 'ওই দিনটার কথা নাকি তিনি কোনো দিনই ভুলবেন না। তার ভাষায়, আমার এক বন্ধু আমার কাছে এসে বলল, নিজাম, বরিশাল থেকে একটা ছেলে এসেছে। ঝিলু নাম। ভালো বেহালা বাজায়। আমরা তখন শিল্পী খুঁজে বেড়াতাম। অ্যামেচার শিল্পী। কোনো অ্যামেচার শিল্পীর খোঁজ

পেলেই শিকারী বাঘের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে এসে ভেড়াতাম আমাদের সংগঠনের মধ্যে। তখন আমাদের মধ্যে ছিল দেশগড়ার এক অনমনীয় সংকল্প। তাই সেদিন ঝিলুর কথা জেনে উৎসাহ পেলাম প্রচন্ড। বললাম, তাকে নিয়ে এসো।

তাকে নিয়ে এলো। ছাই রঙের প্রিন্সকোট গায়ে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আমার চাইতে একটু লম্বা, কালো মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, হাতে বেহালার বাক্স। সৌম্য শালীন ভদ্র চেহারার একটি মানুষ এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মনে হলো, কত যেন চেনা, কত আপনার। মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, আপনিই বুঝি ঝিলু। হ্যাঁ। ঝিলু আমার নাম। ডাকনাম। ভালো নাম আলতাফ মাহমুদ।'

আলতাফ মাহমুদ শিমূলের হাতটা ধরে একটুখানি ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, শিমূল তুই এই বক্তৃতা মুখস্ত করে রেখেছিস নাকি?

'না ভাইয়া। ওনার বক্তৃতা এত সুন্দর হয়েছিল যে আজকেও মনে আছে।'

'বাহবা, তোর মেমোরি তো এখনও শার্পই আছে।'

'না ভাইয়া, বয়স হয়েছে। আজকাল অনেক কিছুই মনে করতে পারি না।'

'না, তোর কথা শুনে মোটেও তা মনে হচ্ছে না।'

'বাদ দাও ভাইয়া। তুমি বলো তো, হারমোনিয়াম বাজানো কবে শিখলে!'

আলতাফ মাহমুদ আড়মোড়া ভাঙলেন, বলতে লাগলেন, 'সেটা মনে হয় ৫৪ সালের দিকে হবে। আমি তো বরিশাল থাকতেই নানা ধরনের সংগঠন করে আসছি। পাকিস্তান আন্দোলনের পরেও গান করেছি। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান! এইসব গান। তারপর ৪৮ সাল থেকেই বামদের সঙ্গে আমার চলাফেরা শুরু হয়ে যায়। আমি কিন্তু বরিশালের সব অনুষ্ঠানে গান গাইতাম। তখন থেকেই বেহালা বাজানো শিখতে শুরু করি। আমার ওস্তাদ ছিলেন বরিশালের শ্রী সুরেন বাবু। গুরু আমাকে একটা বেহালাও প্রেজেন্ট করেছিলেন।'

আলতাফ মাহমুদ মগ্ন হয়ে গেলেন। তিনি কথা বলছেন না, যেন চলে গেছেন কোন অতীতে... তার সামনে চায়ের কাপ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তার সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি বলে চলেছেন, ম্যাট্রিক পাস করি ৪৮-এ, তারপর কিছুদিন আইএসসি পড়েছি ব্রজমোহন কলেজে। শেষ করিনি। শেষ করব কী। গান গাইতে শুরু করেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে। গণসংগীত! ভারতের গণনাট্য সংঘের একটা গান ছিল–ম্যায় ভূখা হুঁ। এই গান গেয়ে শিমূল বিশ্বাসও করতে পারবি না, আমি কিন্তু বরিশাল শহরের একজন পরিচিত গায়ক হয়ে উঠেছিলাম।

শিমূল বললেন, ভাইয়া, বিশ্বাস করব না কেন! খুবই সম্ভব। তোমার মতো গানের গলা আমি আর কারও শুনেছি নাকি! তুমি যদি কোনো মিটিংয়ে গান ধরো, শ্রোতারা তো মুগ্ধ হবেই।

'এই তুই আমার মন জোগানো কথা বলছিস না তো?'

'ভাইয়া আমি তোমার মন জোগানো কথা বলব কেন? আজকেও বাংলাদেশে যারা তোমার গান একবার শুনেছে, যারা তোমার সাথে একটু মেশার সুযোগ পেয়েছে, তারা তোমার ছবি তাদের বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছে, তাদের সবার কাছে তুমি আজও রয়ে গেছ নায়কের আসনে।'

'সত্যি বলছিস!'

'হ্যাঁ।'

আলতাফ মাহমুদ যেন খুশি হলেন। চোখমুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, 'শোন ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে যে দুটো শান বাঁধানো বেঞ্চি ছিল, সেসবে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান করেছি। রাতের বেলা যখন চাঁদ উঠত, তখন আমাকে যেন গানে পেয়ে বসত। আকাশে চাঁদ, মেঘগুলো দৌড়াচ্ছে মনে হচ্ছে চাঁদ নিজেই দৌড়াচ্ছে আর আমি, সেই আকাশের নিচে বসে আছি, গান গাইছি, একটার পর একটা, ভারতীয় সিনেমার গান, খেমচাঁদ প্রকাশ, নওশাদ, রাইচাঁদ বড়াল, শঙ্কর, জয়কিষেন আর ছিল বরিশালের ছেলে অনিল বিশ্বাসের সুর করা গান।

আমি একবার কী করেছিলাম জানিস। গাছের গায়ে খোদাই করে লিখেছিলাম ঝিলু দি গ্রেট। জানিসই তো ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার হাতটা ছিল ভালো। কাজেই একটা কিছু খোদাই করতে হবে। আর করতেই যদি হয় নিজের নামটাই করি। আর নিজের নামটাই যদি লিখি তাহলে তার সাথে দি গ্রেটটা তো এসেই যায়।'

এই পর্যন্ত বলে আলতাফ মাহমুদ নিজের অতীত দিনের কথা মনে করেই যেন আপন মনে হাসতে থাকেন।

শিমূল বললেন, 'তুমি তো গ্রেটই ভাইয়া। ছোটবেলাতে গ্রেট লিখেছিলে নামের আগে, সেটা তো তোমার ভবিষ্যতটা তখন স্থির করতে পেরেছিলে বলে।'

আলতাফ মাহমুদ বলেন, 'আরে নানা। তখন নামের সঙ্গে দি গ্রেটটা একটা ফ্রেজের মতো ছিল তো। তাই আর কী। কীছু বুঝে বা ভেবে ওটা লিখিনি।'

'আচ্ছা, তারপর কী হলো বলো।'

'আমার বাবা নাজেম আলীর শখ ছিল আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবো, যে সে ইঞ্জিনিয়ার না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার। বাবা ছিলেন জেলা বোর্ডের সেক্রেটারি। বাবার চোখে জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারই অনেক বড়। তার চোখে তা হওয়ার তো কোনো লক্ষণই নাই আমার মধ্যে। আমি সারাদিন গান করি। বাবা ক্ষেপে গিয়ে বলেন, বেডার কাণ্ড দেহো, ওরে আবাইগ্যা, গাছটার গায়ে তো লেইখ্যা রাখছোস ঝিলু দি গ্রেট। গান গাইয়া কি গ্রেট হইতে পারবি? নাম তো

লেখাবি গিয়া যাত্রাবয়াতির দলে। বাবার আর কী দোষ বল। তখন তো মানুষ গান গেয়ে একমাত্র হতে পারত যাত্রাদলের বিবেক।'

'তুমি তো তাই হয়েছিলে শেষ পর্যন্ত!'

'কী বলিস তুই? আমি যাত্রাদলের বিবেক হয়েছিলাম?'

'যাত্রাদলের নও। পূর্ব বাংলার বিবেক। যাত্রার বিবেকরা যেমন মন রে বলে মঞ্চে উঠে পড়ে আর গান গেয়ে গেয়ে নায়কের মনের যন্ত্রণার কথা দর্শকদের বুঝিয়ে দেয়, তুমিও তো তাই করেছিলে। গান গেয়ে গেয়ে পূর্ব বাংলার মানুষদের বঞ্চনার কথা ফুটিয়ে তুলেছ সবার সামনে। সাধারণ কৃষক শ্রমিক মজুরদের সংগ্রামের কথা তোমার কণ্ঠেই তো ফুটে উঠেছে ভাইয়া।'

'তুই শুধু আমাকে গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করছিস।'

'মোটেও না। তুমি যা তাই বলছি। আচ্ছা বলো তোমার বরিশালের দিনগুলোর কথা।'

'আমাদের বরিশালের ফকির রোডের বাড়িটা ছিল দোতলা টিনের বাড়ি। উঁচু পাকা ভিটে। পেছনে ছিল পুকুর। তখন বরিশালে পুকুর ছিল না, এমন বাড়ি অবশ্য কমই ছিল। সুপুরি আর নারকেল গাছ ছিল সমস্ত বরিশাল শহর আর গ্রাম জুড়ে। গাছে গাছে সবুজ ছিল তখন আমার পৃথিবী। আর ছিল নদী। কীর্তনখোলা। ছিল খাল। সাঁতার কাটতে পারতাম ছোটবেলা থেকেই। দুষ্টুমিতে ছিলাম সাত গ্রামের মধ্যে সেরা। উঠতে পারতাম না এমন কোনো গাছ ছিল না। আর গাইতে পারতাম না এমন কোনো গান ছিল না বোম্বে কিংবা কলকাতার সিনেমার। অবশ্য আমাদের গ্রামের বাড়ি ছিল মুলাদী থানার পাতারচর গ্রাম।'

শিমূল বুঝতে পারেন আলতাফ মাহমুদকে গল্পে পেয়েছে। তিনি কোনো কথা না বলে মনোযোগী শ্রোতার চোখে তাকিয়ে রইলেন আলতাফ মাহমুদের দিকে।

আলতাফ মাহমুদও বলে চললেন, 'বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হলাম। স্কুলে গিয়েও আমি গান করি। অ্যাসেম্বলিতে গান করিই। অন্য সময়ও করি। ছবি আঁকি। মিলাদে কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করি। এইখান থেকে আস্তে আস্তে বরিশাল শহরের নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট বরিশাল শহরে অনেক তোরণ বানানো হলো। কারণ পরের দিন পাকিস্তান স্বাধীন হবে। আমি সবগুলো তোরণেরই শিল্পী ছিলাম। তরুণ মাহফিলের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান করা হলো, তার প্রধান গায়ক ছিলাম আমি।'

তুমি মেট্রিক পাস করলে কত সালে? শিমূল জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার ম্যাট্রিক ৪৮ সালে। শোন। রেজাল্ট যেদিন বেরুল সেদিন কী হলো! বাবা তো আশা করে আছেন আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করব। যাতে আমি

ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়তে পারি। কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমার মনোযোগ ছিল নাকি? বুঝিস না ৪৭-এর আজাদি আন্দোলনেও তো আমি ছিলাম। তো কোনো রকমে টেনেটুনে পাসটা করলাম। ইজ্জতটা বাঁচল। বাবার তো ভীষণ রাগ। তখন আমি কি আর বাসায় থাকি। বাসার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তুফান। আমি বাসা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম বেলপার্কের কাছে, কীর্তন নদীর ধারে, ওইখানে একটা বেঞ্চে বসে আমি গলা ছেড়ে গান ধরেছি, সায়গলের গজল, দুনিয়া মে হু দুনিয়াকি তলবগার নহি হু, বাজার সে গুজরা হুয়া খরিদদার নহি হু।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। বাটার দোকানে চাকরি নিয়েছিলাম। আর গান করছি। ওই সময় আস্তে আস্তে আমার ভেতরে বদলটা ঘটতে থাকে, আমার ঝোঁক বাড়তে থাকে গণসংগীতের দিকে। ওই সময় বরিশালে পাটচাষী আর নদীসিকস্তি চাষীদের একটা সম্মেলন হয়। কমিউনিস্টরাই ছিল আসলে ওই সম্মেলনের পেছনে। আমিও সেখানে গাই গণনাট্য সংঘের সেই বিখ্যাত গানটা -- মে ভুখা হুঁ।"

"এই গানটার কথা তুমি তো আগেও বললে।"

"বলতেই হবে। ওই গানটাই তো আমাকে বরিশালে পরিচিত একটা গায়ক বানিয়ে ছাড়ল।"

"আর তোমার বাঁশি বাজানো, ছবি আঁকা।"

"সেসবও চলছে সমানে। বাঁশি তো মনের আনন্দে একলাই বাজানো যায়। আর ছবি আঁকা, পোস্টার লেখা, সেসবও চালিয়ে যাচ্ছি।"

"ছবি আঁকতে পারতে বলেই ঢাকায় এসে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলে।"

"না আমি আসলে ঢাকায় আসি গানের টানে। তবে এসে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটা আর কন্টিনিউ করিনি।'

৪.

"ভাইয়া তুমি কিন্তু বলবে তোমার হারমোনিয়াম শেখার ঘটনাটা। কী করে শিখলে? কবে শিখলে? সেইটা না বলে কত কথা বলছ!' শিমূল তাঁকে প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, "আরে সেটাই তো বলছি। তার আগে ভূমিকাটা সারতে দে।"

"আচ্ছা সারো। তুমি তোমার মতো করে বলো।"

আলতাফ মাহমুদ একটু কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলে চললেন," ঢাকায় তো এলাম! নিজামুল হকের সাথে গেন্ডারিয়ার একটা বাসায় থাকি। এক বিছানায় ঘুম। নিজামুল হকের সঙ্গে। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে না খাওয়া! পয়সার অভাবে না খেয়ে থাকতে হয়েছে বহুদিন। রিহার্সাল থাকলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যেতাম-- গেন্ডারিয়া থেকে ধানমণ্ডি, যোগীনগর, ওয়ারি, আরমানিটোলা, পুরানা পল্টন। রিহার্সালও হতো একেকদিন একেক জায়গায়!

"তুমি হারমোনিয়াম বাজানো কোথায় শিখলে, সেই গল্পটা ..." শিমূল হেসে ফেললেন।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, "আরে আমি তো ওই গল্পটাই করছি। তুই এত হারমোনিয়াম নিয়ে লেগে পড়লি কেন?"

"না না। তুমি যেভাবে বলতে চাও বলো। আমি আর তোমার কথায় ইন্টারাপ্ট করছি না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। সেই গল্পটা! সেই গল্পটা বলতে হলে তো বলতে হবে আমার নামে কেন হুলিয়া বের হলো। আমি ঢাকায় থাকি। গান করি। বিভিন্ন জনসভায় আমাদের ডাক পড়ত। বিভিন্ন মানে মুসলিম লীগ বিরোধী জনসভায়, সমাবেশে। আমরা মুসলিম লীগ বিরোধী নানা গান, জারিগান, স্বৈরাচারবিরোধী গান সেই সব করতাম। তারপর শুরু হলো ছায়ানাট্য করা। নৃত্যনাট্য করতাম কিষানের পালা। ছাত্র, মজুর, কিষাণের জীবনভিত্তিক ছায়ানাট্য এইসব করতাম। জানি না তুই বিশ্বাস করবি কিনা, একটা গীতিছায়ানাট্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। কী যে তাদের উৎসাহ এই নাটকের ব্যাপারে ছিল!

তো এইভাবে দিন যাচ্ছে। ধূমকেতু সংঘের নাম বদলে রাখা হলো পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ। এটা আসলে ছিল যুবলীগের কালচারাল ফ্রন্ট। ৫৪ সালের নির্বাচনের সময় আমার ডিউটি পড়ল মঠবাড়িয়ায়, ওখানে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী মহিউদ্দীন আহমেদের নির্বাচনী এলাকায়। আমি তো ওই জায়গায় কাজ করবই। কিন্তু আমরা করলাম কী, গানের দল নিয়ে সারা বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। জনসভায় বক্তৃতার চেয়ে আমাদের গানেই কাজ হচ্ছে বেশি। নির্বাচনের সময় পুরো বরিশালের নানা জায়গায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গান গেয়ে বেড়াচ্ছি।"

"তোমার বাবা না সেইবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রার্থী হিসেবে?" শিমূল বললেন।

"হ্যাঁ। বাবা দাঁড়িয়েছিলেন মুলাদী থেকে। আমি কি আর বাবার পক্ষে প্রচারণা চালাব নাকি। আমি গেলাম যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীর পক্ষে। তো সেইবার যুক্তফ্রন্ট ভোটে জিতল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা কি আর আমাদেরকে মতায় থাকতে দেবে। তারা পূর্ব বাংলায় ৯২/ক ধারার শাসন জারি করল। আমাদের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হলো। আমার নামেও হুলিয়া জারি হলো। আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম।"

"এইবার তোমার নামে হুলিয়া জারির প্রোপটটা আমরা জানতে পারলাম। এইবার নিশ্চয়ই তোমার হারমোনিয়াম শেখার..."

"আসছি। আসছি। সেই জায়গাটাতেই আসছি। আমি তখন বরিশালে। এক জেলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। নৌকার জেলেদের সঙ্গে থাকতাম। তো একদিন খুব জ্বর। জ্বরের মধ্যে কী এক কাজে এসেছি বরিশাল শহরে। কালিবাড়ি রোডে যে পুলিশের গোয়েন্দা আমাকে দেখে ফেলে থানায় খবর দিয়েছে আমি টেরই পাইনি। তারপর এক সময় দেখি পুলিশ। দে দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে সামনে পড়ল পুকুর। পুকুরে লাফ দিয়ে কোনো রকমে নাকটা ভাসিয়ে অন্ধকারে চুপ করে ডুবে থাকলাম গলা পানিতে। পুলিশ এসে চলে গেল টেরও পেল না। সেখান থেকে ভিজে গায়ে আমি যাই কই। তার ওপর শরীরে জ্বর। সেখান থেকে গেলাম কেশব বাবুর বাসায়। সেখান থেকে গেলাম বুবুর বাসায়।

এই যে কদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম, তখনই হারমোনিয়ামটা বাজানো একেবারে রপ্ত করে ফেলি। এই হলো তোর হারমোনিয়াম শেখার ইতিহাস। হলো?"

শিমূল বললেন, ভাইয়া তোমার চা তো ঠাণ্ডাই হয়ে গেল।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, হোক ঠাণ্ডা। গল্প করতেই তো ভালো লাগছে।

চায়ের ঠাণ্ডা কাপটা দুই হাতে মুঠো করে ধরেন আলতাফ মাহমুদ।

শিমূল তার বিছানার চাদরটা একটু ঠিক করে নিয়ে ফের গল্প করতে বসেন। তার নাকে এসে লাগছে কামিনী ফুলের তীব্র ঘ্রাণ।

৫.

কামিনী ঝাড়টা নিচতলায়, বিল্ডিংটার এককোণে। কিন্তু তার গন্ধ এই তিনতলা পর্যন্ত চলে আসে! শুধু যে চলে আসে, তাই না, ঘরের পরিবেশটাকে ঘোরলাগা করে তুলতে পারে! শিমূলের একবার মনে হলো, ঘরজুড়ে যে সুগন্ধ সেটা হয়তো কামিনী ফুলের নয়, স্বর্গ থেকে আসা, আলতাফ মাহমুদ এই সৌরভ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

আলতাফ মাহমুদ কাঠের মঞ্চটার ওপরে দুই পা ছড়িয়ে বসলেন। হারমোনিয়ামে খানিকক্ষণ সারেগামা বাজালেন। তারপর চুপ করে রইলেন।

শিমুল বললেন, ভাইয়া। তুমি যে আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটার সুর করেছিলে, সেই কথাগুলো কি তোমার মনে আছে।

আলতাফ মাহমুদ মাথা নাড়লেন, "নারে। কিছু মনে থাকে না। সন তারিখ তো একদমই না। আবদুল গাফফার চৌধুরী গানটা লিখেছিলেন ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। ৫২ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়ে উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তো প্রথমে তো সুর করেন আবদুল লতিফ সাহেব। আমি তখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি, ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি, ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়--এইসব গান গাইছি।'

"লতিফ সাহেবেরই সুর করা গান তো পরেরটা?" শিমূল বললেন।

"হ্যাঁ। অন্যদের লেখা, সুর করা গান। আমি গাই। লোকের মনে আগুন জ্বালাই। এর মধ্যে একবার আমার কাছে এলো আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো ... এই গানটা। আমার মনে হলো এটার তো সুর দিতে হবে। আমি জানতাম না লতিফ সাহেব আগেই একটা সুর দিয়ে গেয়েছেন। তখন তো আর রেডিওতে এইসব গান বাজত না। রেকর্ডও বের হতো না। মুখে মুখে গান গাওয়া আর সুর করা। তো গাফফার চৌধুরীর কাছ থেকে আমি কিন্তু অনুমতি নিয়েছিলাম সুর করার। কয়েকবার সুরটা মডিফাই করে ফাইনালটা এলো। কয়েকটা অনুষ্ঠানে গাইলাম। সর্বশেষ সুরটা হয়ে যাবার পরে যখন গাইলাম, দেখি লোকের চোখ ভিজে যায়। সবাই গানটা আপন করে নিল। সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল এই গান, এই সুর। আমাকে শেখ লুতফর রহমান বললেন, "কতগুলো তাজা তরুণ

ছেলে মায়ের সম্মান, ভাষার সম্মান রাখার জন্য রক্ত দিয়েছে। আর তোমার গানের সুরের সঙ্গে সেই আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যটা ধরা পড়েছে। অনেকটা চার্চ মিউজিকের মতো।' লুতফর দাদার কথা শুনেই মনে হলো, গানটার একটা কিছু হবে। এই তোরা এখনও গানটা গাস তো!

"কী বলো ভাইয়া তুমি! এই গানটা তো আমাদের সবচেয়ে প্রিয় গানগুলোর একটা। সর্বকালের সেরা গানগুলোর একটা। কিছুদিন আগে বিবিসির জরিপে এই গান সেরা গানগুলোর একটা হয়েছে। যখনই এই সুরটা, ওই হামিংটা বেজে ওঠে, তখনই সব কিছু থমকে যায়। সবার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। চোখ ভিজে আসে। অন্তর শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। বলো কী, এই গান আমরা গাইব না! যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন বাঙালি এইগান গাইবে। চিরদিন গাইবে।"

শিমূলের চোখে জল। ভোরের আলোয় তার চোখের জল টলমল করছে। তিনি ধীরে ধীরে গাইতে লাগলেন, আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি!

৬.

আলতাফ মাহমুদ নীরবে বসে শিমূলের গান শুনতে লাগলেন।

শিমুল থামলে হঠাৎই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, শিমূল একাত্তর সালের কথা তোর মনে আছে?

শিমূল একটু জোরের সঙ্গে বলে উঠল, থাকবে না কেন দাদা? একাত্তরের কথা কে ভুলতে পারবে? কেউ পারবে না!

"এই বাসায় তো তখন তুই থাকতি না। আমরা থাকতাম না!"

"আমরা তখন থাকতাম রাজারবাগের বাসায়। রাজারবাগের বাসাতেই মুক্তিযোদ্ধারা আসত। তুমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্যে গান করে সেখান থেকেই পাঠাতে। তুমি ধরাও পড়লে ওই বাসাতেই।"

"ভাইয়া তুমি অন্য কথা বলো। ওই দিনের কথা মনে হলে আমার কষ্ট হয়। অনেক কষ্ট। তুমি বরং বলো আমাদের কমলাপুরের বাসাটার কথা। ঝিনু আপুর সঙ্গে তোমার বিয়ে তো কমলাপুরেরই বাসায়।"

"কী কথা বলব।"

কথা ঘোরানোর জন্যে শিমূল বললেন, তোমাদের ম্যারেজ ডে কবে বলো তো।

"কবে?"

"ভাইয়া, আপা শুনলে কত মন খারাপ করবে?"

"তোর ঝিনু পা এখনও ১৬ অক্টোবর পালন করে বুঝি?"

"আর পালন! মনে রাখে। মনে করে। আমরা সবাই মনে করি।"

"আমার যে বছর বিয়ে হলো, ১৯৬৬ সালে, তখন তুই কত ছোটো।"

"আমার কাছেই তো তুমি আসতে আমাকে গান শেখাতে। সেই গর্বে এখনও আমার মাথাটা উঁচু হয়ে ওঠে। আমি সবাইকে গর্ব করে বলি, আমার গুরু ছিলেন আলতাফ মাহমুদ।"

"ঝিনু কচি কাঁচার মেলা করত। সুফিয়া কামালের সাথে বরিশাল গেল। আমিও বরিশাল গেলাম। সেখানে যেতে যেতেই ঝিনুর সঙ্গে আমার পরিচয়। জাহাজে।"

"সেটা যেন কত সাল?"

"১৯৬৩।"

শিমূল খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন, 'আমি তখন কত্ত পিচ্চি!'

আলতাফ মাহমুদ বললেন, "স্টিমারে চড়ে বরিশাল যাচ্ছি। এই সময় একটা পিচ্চি মেয়ে...আমি তো প্রথমে খেয়াল করিনি। জাহাজটা বেশ বড়সড়ই ছিল। সুফিয়া কামাল ছিলেন। আমরা যাচ্ছি কচি-কাঁচার মেলার প্রগ্রাম করতে। বাচ্চারা গান করছে। আমার মাইজা ভাই সাইজা ভাই কই গেলা রে। চল যাই চল যাই মাঠে ধান কাটিতে..."

"তারপর?"

"আমি রেলিং ধরে আকাশ দেখছি। নদী দেখছি। দূরে জেগে ওঠা চরে একটা কানাবকের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেখছি। একটু তন্ময়ই হয়তো হয়ে পড়েছিলাম।

তো একটা কিশোরী আমাকে বলে, এই যে, একটু সরুন না। যাবো।'

'ওমা বলল এই কথা। তারপর?'

'আমি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হয়তো মেয়েটা কয়েকবারই বলে থাকবে কথাটা। আমি শুনতে পাইনি। শেষে সে বলে বসে, এই যে আপনি কানে শোনেন না।

আমি বলি, কিছু বললে?

দুই বেণী দোলানো মেয়েটি বলে, আমরা একটু যাবো। আপনি একটু সরে দাঁড়ালে আমাদের উপকার হয়।

আমি বলি, দেখেছ। পূর্ববাংলা কত সুন্দর।

সে বলে, পূর্ব বাংলা বলছেন কেন। এটা তো পূর্ব পাকিস্তান।

আমি বলি, তুমি তো ছোট। বড় হও। বুঝবে।

সে বলে, আমি অনেক বড় হয়েছি। আপনি বলুন।

আমি বলি, তুমি যেন কোথায় যাচ্ছিলে। যাও। পরে কথা বলব।

এই মেয়েটিই হলো তোমার বোন ঝিনুক।"

"আপা!" শিমূল হাসিমুখে বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গি করে!

"হ্যাঁ।"

"ও তোমাকে চেনে না যে তুমি আলতাফ মাহমুদ? বিখ্যাত মানুষ। আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো গানের সুরকার!"

"আরে আমি কি সব সময় বিখ্যাত বিখ্যাত ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াই নাকি।'

'কী বলো। তুমি তো ছিলে তখন সবার প্রিয় মানুষ, বললাম না তোমাকে, অনেকের চোখেই ছিলে একেবারেই নায়কের মতো।"

"আরে কী বলিস। অবশ্য ওর বন্ধু ওকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলছিল, আমি

শুনতে পাচ্ছিলাম, ঝিনু, তুই কার সঙ্গে তর্ক করছিলি তুই জানিস।

ঝিনু বলছিল, কার সঙ্গে?

বন্ধুটি ফিসফিস করে বলছিল, উনি আলতাফ মাহমুদ। সুরকার।

তো?

উনি কোন গানটা সুর করেছেন তুই জানিস।

কোন গানটা?

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...”

“তারপর আপা তোমার কাছে ছুটে এলো?” শিমূল জিজ্ঞেস করলেন মুখটা উজ্জ্বল করে।

আলতাফ মাহমুদ হেসে বললেন, “তাতো এলোই। এসে বলল, আপনি আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটার সুর করেছেন?

ও তখন উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে!

আমি বললাম, হাঁ।

কী করে করলেন?

মানে?

একটা মানুষ সুর করে কেমন করে, সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য লাগে।

কী রকম।

দুনিয়ায় কত গান। কত সুর। একটার সুর আরেকটার সাথে মেলে না। আর আপনার আমার ভায়ের রক্তে রাঙানোর সুরটা তো....একেবারে বুকের মধ্যে এসে লাগে...সমস্ত শরীর ঝিম ধরে... চোখে পানি চলে আসে।”

শিমূল বললেন, “আপা এইসব বলল!”

“হ্যাঁ বলল। বলে ঝুপ করে আমার পায়ে পড়ে গেল।

আমি বললাম, এই করো কী করো কী?

ঝিনু বলল, আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো গানের সুর যিনি করতে পারেন, তার পা ছুঁতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি বললাম, এই পাগলি। কী বলে!

ঝিনু কী বলল জানো, ঝিনু বলল, এই সুর যিনি করতে পারেন তিনি মানুষ না তিনি ... হি ইজ অ্যান এনজেল।

‘যা! আপা বুঝি এই রকম কথা বলতে পারত!’ শিমূল ভুরু কুঁচকে বললেন।

‘হ্যাঁ।’

‘তারপর?’

এরপরে জাহাজে আমরা অনেক গান করলাম। ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায় গাইলাম, রাষ্ট্রভাষা করিলি রে বাঙালি গাইলাম, আর ঝিনু

আমার পাশে পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল"--বলে আলতাফ মাহমুদ হাসতে লাগলেন। কী যে সুন্দর লাগে তাকে হাসলে!

শিমুল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "তারপর তো তুমি প্রায়ই আসতে আমাদের বাসায়। আমাকে গান তুলে দিতে। আমি তো বুঝিনি তুমি আমার কাছে আসতে না। আসতে আপার কাছে। তাকে বিয়ে করবে এই ছিল তোমার মতলব।"

"হা হা হা হা। কিন্তু গান কি তোকে আমি উজার করে শেখাই নি?"

"তা শিখিয়েছ। জানি না কতটা পেরেছি।"

"আমি মারা গেছি সেই কবে। একাত্তরে। ৩৬ বছর। এই ৩৬ বছরে তোরা নিশ্চয়ই অনেক নতুন গান বেঁধেছিস। একটা শোনাবি নাকি?"

"না না। তোমাকে শোনানোর মতো কোনো গান তো আমার নেই ভাইয়া।"

"কী বলিস? নতুন গান শিখিসনি একটাও।"

"তা শিখেছি। গাইব। তুমি এসেছ গাইতে তো হবেই। কিন্তু এখন গল্প শুনতেই বেশি ভালো লাগছে। তারপর কী হলো! তুমি আপাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বাসায়। আব্বা আম্মা রাজিই হচ্ছিলেন না। তোমার বয়স আপার তুলনায় অনেক বেশি ছিল তো তাই!"

আলতাফ মাহমুদ বললেন, "সেই। ভাগ্যিস সুফিয়া কামাল ছিলেন। তিনি তোদের বাসায় বলে-কয়ে রাজি করালেন।"

"আসলেই। সুফিয়া খালাম্মা যে কত জনের কত উপকার করেছেন। ভাইয়া জানো। সুফিয়া খালাম্মাও মারা গেছেন।"

"কবে রে?"

"এই তো। বেশ কয়েক বছর আগে! আমরা সবাই সুফিয়া কামালের অভাবটা খুব ফিল করি। আচ্ছা যে কথা হচ্ছিল...তোমাদের বিয়ে হলো...১৯৬৬তে।"

"হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে হলো। বিয়ের পরে ঝিনুর ওপরে অনেক জুলুম করেছি, না?"

"করেছোই তো। ছোট্ট একটা মেয়ে। বউ হয়েছে আপনার। আপনি তাকে সময় দেবেন না। ৬৮ সালে তোমাদের বাচ্চা হলো। মেয়ে–শাওন। তাকেও কি তুমি যথেষ্ট সময় দিয়েছো বলো!"

"তা দিই নি বলছিস! আমি কিন্তু মেয়ের মুখ দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম!"

"তা তো হবেই। কী রকম ফুটফুটে মেয়েই না ছিল শাওন।"

"হ্যাঁ। আমি তো তোদের সাথেই থাকতাম। তোরাই তো ওদের দেখতি। আমরা সবাই মিলে রাজারবাগের বাসায় চলে এলাম। তোর মাকেই তো আমি

নিজের মা বলে ভাবতাম। এইটাই ছিল আমার রকম-সকম। ছোটবেলায় নিজের গর্ভধারিণী মাকে দেখেছি অপ্রকৃতস্থ, ছোটমার কাছেই মানুষ হয়েছি। তারপরে যেখানে গেছি, যে পরিবারে থেকেছি, সেই পরিবারটাকেই নিজের করে তুলেছি।"

"তা ঠিক। আবার সংসারে থেকেও তুমি ঠিক সংসারি ছিলে না ভাইয়া। তুমি তো বিয়ের আগে যেমন ছিলে, বিয়ের পরেও তেমনি রয়ে গেলে। গণসংগীত। নৃত্যনাট্য। ফিল্মের জন্যে গান করা। ইউনিভার্সিটি তে ফাংশন করা। মিটিং মিছিলে গান করা। শহীদ মিনারে সমাবেশ করা।

দেশ, জনগণ, পার্টি, মানুষ, বাঙালি, বাংলাদেশ এইসবই ছিল তোমার ধ্যানজ্ঞান। ৬৮ সালে তোমার মেয়ে হলো। শাওন। তবু তুমি আগের মতোই রয়ে গেলে।"

"কত গান করেছিলাম। নারে। টাকা কিন্তু কমই পেয়েছি। গান করেছি, সুর করেছি নেশায়। গানের নেশা। সুরের নেশা। আর দেশের নেশা।"

"তুমি না একটা খামারবাড়ি করতে চেয়েছিলে দেশের বাড়ি গিয়ে?"

"সেটা আর করা হলো কই। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন--একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আর আমিও সেই স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি।"

আপার কাছে শুনেছি, "ঘর সাজানোর শখ ছিল তোমার, খুব। কখনও কখনও আপাকে ঘর সাজাতে সাহায্য করতে তুমি। তোমার প্রিয় পোশাক ছিল পায়জামা আর পাঞ্জাবি।"

"আর একটা চাদর অবশ্য লাগত!"

"রাইট। আর সব বাঙালির মতো তোমারও প্রিয় ছিল ভাত-মাছ।"

"মাছভাজা আর দোপেঁয়াজি!"

"প্রত্যেক বছর তুমি একবার করে বাড়ি যেতে। আপাকে নিয়ে যেতে! ঈদুল আজহায়!"

"ঠিক বলেছিস।"

"ঠিক বলব না কেন। আমরা ঈদুল আজহায় তোমাকে আর আপাকে মিস করতাম না! আর ছোট্ট শাওনই তো বাড়িটা ভরপুর করে রাখত। ঈদে যখন তোমরা থাকতে না, আমাদের বাসাটা খালি খালি লাগত না!"

"ঈদে বাড়ি যাওয়ার জিদটা কিন্তু ঝিনুই ধরত। ও বলত, দেখো তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। কোনো কিছুর জন্যে জোর করি না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি তোমায় জোরই করব। অন্তত একটা ঈদ বরিশালের বাড়িতে করতে গবে।"

"হ্যাঁ। আপাই জোর করে তোমাকে ঈদুল আজহায় বাড়ি নিয়ে যেত।"

"আর ছিল শাওন! আমার ছোট্ট মেয়েটা। শাওন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। আমি ওকে নিয়ে কত খেলেছি। বিছানায় বালিশগুলোকে ঘোড়া বানিয়ে খেলত ও!"

আলতাফ মাহমুদের চোখ ভিজে আসে নাকি। শিমূল কথা ঘোরাতে চান। বললেন, "ভাইয়া, তুমি কিন্তু আমাকে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোয় নিয়ে গিয়েছিলে শহিদ মিনারে। গান গেয়েছি অনুষ্ঠানে। ৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে তোমার সঙ্গে গেছি বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজের মিছিলে।"

"হ্যাঁ। আমরা গান গেয়ে চাঁদা তুলেছি পথে পথে, মিছিল করে করে।"

"এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখব। এই গানটা তোমারই সুর করা ছিল ভাইয়া। ৭১ সালেও তোমার হাত ধরে গেছি শহিদ মিনারে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে।"

একাত্তর! একাত্তর! ভোরের আলোয় আলতাফ মাহমুদের ঠোঁট দুটো কাঁপছে, শিমূল দেখলেন! তিনি তাড়াতাড়ি করে বললেন, ভাইয়া, "তোমার করাচি যাওয়ার কথা মনে আছে।"

আলতাফ মাহমুদ কিছুক্ষণ শূন্য চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, কিছু বলছিলি!

'তোমার করাচি যাওয়ার কথা মনে আছে?'

"হ্যাঁ, আছে। আমার যাওয়ার কথা ছিল ভিয়েনায়। শান্তি সম্মেলন। তুই তো জানিস, আমি শান্তির পক্ষে। ওই যে গান গেয়েছি না, --

আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি
কেউ বা চলে ডাইনে বা কেউ বাঁয়ে চলি
এক সাগরে তুলেছি ঢেউ
কেউ বা ধর্মী বিধর্মী কেউ
সবার চোখে স্বপ্ন জাগে
স্বাধীন সুখী দেশ
শান্তি ঘেরা ঘরে ঘরে প্রাণের পরিবেশ
মোরা তখন সবাই একসাথে ভাই মিলি...
যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি?

শিমুল আর আলতাফ মাহমুদ একযোগে গেয়ে ওঠেন --

শান্তি শান্তি...

গান শেষ হলে আলতাফ মাহমুদ বললেন, "তো ভিয়েনায় শান্তি সম্মেলন হবে। আমাকেও মনোনীত করা হলো সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে যাব ভিয়েনায়। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ টিকেট পাঠালেন আমার নামে। আমি করাচি গেলাম। কিন্তু করাচিতে গিয়ে কী এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়লাম। আমার পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে। আমার টিকেটে আরেকজন চলে গেলেন ভিয়েনায়।

কী রকম খারাপ লাগে বলো। তো আমি রাগে-দুঃখে করাচি রয়ে গেলাম। সেইখানে বিখ্যাত সংগীত পরিচালক তিমির বরণ আর দেবু ভট্টাচার্য্যের সাহচর্য পেলাম।'

'ওই করাচিতেও আপনি আসর জমিয়ে ফেললেন। বাঙালিদের নিয়ে গান করেন।' শিমূল খেই ধরিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ। পরে নিজামুল হক গেল। ভিলেজ এইড ডাইরেকটরেটের চাকরি নিয়ে। গান গাইতে গেছেন শিল্পী মাহমুদুন নবী, শেখ লুতফর রহমান, নৃত্যশিল্পী আমানুল হক, আফরোজা বুলবুল। আমরা গান করি। মাছভাত খাই বাঙালিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে। সব বাজার খুঁজে খুঁজে মৌরালা মাছ কি রুই মাছের মাথা জোগাড় করি। বাঙালি ভাবিদের এনে এনে দিই। মাছ ছাড়া আমার চলে নাকি! ওইখানে ওই করাচিতে প্রতিষ্ঠিত হলো নজরুল একাডেমি, বুলবুল ললিত কলা একাডেমি। কত যে অনুষ্ঠান করেছি। ইস্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানি মহিলা সমিতি ছিল।'

"তুমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিমও তো ওই করাচিতেই নিলে?" শিমূল বললেন।

আলতাফ মাহমুদ দু হাতের আঙুল ফোটাতে ফোটাতে বললেন, "হ্যাঁ। ওস্তাদ আবদুল কাদের খাঁ, ওস্তাদ রমজান আলী খাঁ, ওস্তাদ ওমরাও বুন্দু খাঁ, তবলা নেওয়াজ ওস্তাদ আল্লাদিত্তা, সেতারিয়া ওস্তাদ জিরে খাঁ, ওস্তাদ কবীর খাঁ, বীণাকার ওস্তাদ ফকির হাবীব আলী খাঁ–অনেক বড় ওস্তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ করাচিতেই হয়েছিল।"

'ভাইয়া, তোমার ওই ঘটনাটা বলো না!'

"কোনটা?"

"ওই যে তুমি এক বাসায় বড় বড় ওস্তাদদের সামনে বাংলা গান গাইলে!"

"না না সে তেমন কিছু নয়..."

"তবুও বলো না!"

"একটা বাসায় গানের বড় জলসা বসেছে। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর ছেলে মুনওয়ার আলী খাঁ, সুর সম্রাজ্ঞী বলে পরিচিত রৌশন আরা, ভারতের একজন দৃষ্টিহীন বংশীবাদক ও বীণাবাদক– এই রকম বড় বড় ওস্তাদরা সেখানে উপস্থিত। এইখানে ওস্তাদ ফকির আলী খাঁ সবার সঙ্গে শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকেও পরিচিত করালেন। তারপর বললেন, বেটা আলতাফ, এক বাংলা গান শুনা দো। এখন আমি কী গাই, এত বড় বড় ওস্তাদদের সামনে? আমি তখন ওস্তাদ ফকির হাবিব আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপ বাতাইয়ে কেয়া গাঁউ। উনি বললেন, ফানকার গা দিল যো গানে চাহে ওহি গানা ছহি হ্যায়। তুম তো

ফানকার হো বেটা। শুনে একটু সাহস হলো। গান ধরলাম, মাঝি তরী হেথা বেঁধো নাকো। ভালোই গাইলাম।"

"আরে গানের যে সবাই তারিফ করল আর ওস্তাদ ওমরাও বুলু খাঁ যে কী একটা বললেন, সেইটা বলো।"

"তুই বল।"

"না আমি উর্দু পারি না।"

"ওস্তাদ ওমরাও বুলু খাঁ বললেন, সোবহান আল্লাহ, যেইসা আওয়াজ, ওইসাহি ধুন। এক ছে বেহতর হ্যায়। ম্যায়ভি থোড়া বহুত তুমকো দেগাঁ। মেরা ঘর আনা ভাই।"

"ভাইয়া তুমি রেডিওতে তো প্রথম গাইলে ওই করাচিতেই।"

"হ্যাঁ, রেডিওতে প্রথম গান করলাম। শোন, করাচি রেডিওতে প্রথম দিনে কিন্তু আমি একটা বাংলা গানও গেয়েছিলাম, জীবনের মধুমাস মোর দুয়ারে আজ কী কথা বলে যায়। সুরটাও কিন্তু আমারই। তারপর আমি ইত্তেহাদে মুসিকি নামে একটা অনুষ্ঠান প্রডুস করেছি রেডিওতে। তাতে পূর্ববাংলার লোকসংগীত, জীবন্তিকা, গীতিনাট্য–এইসব প্রচার করতাম। এই অনুষ্ঠানে আমি জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতাম। লিখতাম, সুর করতাম, মিউজিক করতাম। সবই।"

"তুমি সিনেমার জন্যেও গাইলে করাচিতে।"

"হ্যাঁ। জাগো হুয়া সাবেরা সিনেমায়।"

"ওটা তো খুবই বিখ্যাত ছবি! পদ্মা নদীর মাঝির গল্প! খুব নাম করেছিল ছবিটা। দেশে-বিদেশে এখনও এইটার সুনাম আছে।"

"তাই নাকি! আমি গেয়েছিলাম হাম হর নদীকা রাজা।"

"ওই গানটাও খুব বিখ্যাত হয়েছিল, না ভাইয়া?"

"হ্যাঁ। যেখানেই যেতাম বার বার করে অনুরোধ আসত, ওই গানটাই গাইতে হবে। জাগো হুয়া সাবেরার সংগীত পরিচালক ছিলেন তিমির বরণ আর সহকারী সংগীত পরিচালক ছিলেন দেবু ভট্টাচার্য্য। এরা আমাকে অনেক দিয়েছিলেন রে। আমাকে সিনেমার সংগীত পরিচালনার সুযোগও এদেরই কারণে। বিশেষ করে দেবু ভট্টাচার্য্য। শোন, তিমির বরণ আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, সিনেমার সংগীত পরিচালক হও, সুরকার তো তুমি আছই, কিন্তু দুটো জিনিস তুমি ছেড়ো না। এক : গণসংগীত। কারণ ওটা তোমার প্রাণের জিনিস। দুই : উচ্চাঙ্গ সংগীত। কারণ ওইটা হলো তোমার বেস।"

"বেহুলা, রহিম বাদশা ও রূপবান–এইসব সিনেমার সংগীত পরিচালনা তো তোমার করা!"

"হ্যাঁ। আরও অনেক ছবি আছে। ক্যায়সে হুঁ, কার বউ, আগুন নিয়ে খেলা,

দুইভাই, সংসার, আঁকাবাঁকা, নয়নতারা..."

"গান গেয়েছও তো তুমি ছবির জন্যে!"

"তানহা ছবিতে গান গেয়েছি বেহুলা, আঁকাবাঁকা, কখগঘঙ, কুচবরণ কন্যা, সুয়োরানী দুয়োরানী...

শিমূল হাসছেন–"ভাইয়া, একটা কথা কিন্তু তুমি পাড়ছই না। তুমি তো সিনেমায় অভিনয়ও করেছিলে!"

আলতাফ মাহমুদও হাসতে থাকেন।

"আঁকাবাঁকা আর কখগঘঙ ছবিতে করেছিলে অ্যাকটিং–তাই না!" শিমূল বলেন।

"তোর মনে আছে দেখা যাচ্ছে।"

"তো তোমার কিন্তু হিরোই হওয়া উচিত ছিল। তুমি কিন্তু পর্দায় না হলেও বাস্তবের জীবনে ছিলে নায়কের মতো। সবাই তোমাকে হিরোই মনে করত।"

"বাদ দে তো।"

"তোমার গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো না ভাইয়া আমার কাছে নাই। প্রথম রেকর্ড বেরুল তোমার ৫৮তেই, না!"

"হ্যাঁ। পালের নৌকা পাল উড়াইয়া যায়।"

৭.

শিমূল আরেক কাপ চা করে এনেছেন। সেটা সামনে রেখে বললেন, আচ্ছা, তোমার ফ্রিজ কেনার গল্পটা তোমার মনে আছে, ভাইয়া!

আলতাফ মাহমুদ বললেন, তুই কোনটার কথা বলছিস?

"আপা প্রায়ই বলেন। আপা গরমের সময় একদিন বললেন, ইস যদি ঠাণ্ডা পানি খাওয়া যেত। অমনি তুমি বেরিয়ে গেলে। ফিরে এলে ঠেলাগাড়ির উপরে ফ্রিজ নিয়ে। আর একবার শাওন জাম খেতে চেয়েছিল। পাশের বাড়ির কে না কে তাকে জাম দেয়নি। এই জন্যে সে কাঁদছিল। সে কথা শুনে তুমি একমণ কালো জাম কিনে এনেছিলে।"

"হ্যাঁ। এই কথাটা মনে আছে।"

"আর তুমি যে শাওনের জামায় ছবি এঁকে দিতে।"

"দিব না! ছোট্ট মেয়েটা আমার। ওর তো সব কিছুই মায়া দিয়ে বানানো। ওর হাসি, ওর আধো আধো কথা। আর আমিও তো আধা আর্টিস্ট। আমি আর্ট কলেজে পড়েছি না কিছুদিন!"

"হ্যাঁ। তুমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতে। রওশন আপার বিয়েতে তুমি নিজের আঁকা ছবি উপহার দিয়েছিলে।"

"এই এত কথা হচ্ছে। একটু গান হবে না। তোর গান শুনব বলেই না বসা হারমোনিয়াম নিয়ে। নে ওই গানটা ধর।"

"কোনটা ভাইয়া?"

"ওই যে সত্তুরের সাইকোনের পরে যেটা লিখেছিলাম।

এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখব
এই বন্যা মোরা রুখব
মায়েদের বোনেদের শিশুদের
অশ্রু মুছবই।

কত অবহেলায় মোরা কেঁদেছি
কত ভাঙাবীণায় সুর সেধেছি
কত পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছি।

আর তো শুনব না
কোন বাধা মানব না
আমাদের পাওনা
হিসাবের খাতাতে তুলবই।

দুজনে একসাথে কণ্ঠ ছাড়লেন। তাঁদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, আলতাফ মাহমুদ হারমোনিয়াম ছেড়ে মাঝেমধ্যেই হাত তুলছেন আকাশে, তাদের চিবুকে দৃঢ়তা, তাদের কণ্ঠে আগুন আর বিশ্বাসের ছোঁয়া।

গান শেষ হলে আবার নীরবতা।

নীরবতা ভাঙলেন শিমূলই।

৮.

শিমূলের এক সময় মনে হলো, ভোর হয়েছে কখন। এখন তো অনেক রোদ থাকবার কথা বাইরে। জানালা দিয়ে রোদের ফালি এসে পড়ে থাকবে মেঝেতে। কই তেমন কিছু ঘটছে না কেন। কী জানি আজকের ভোরে কোনো কিছুই তো স্বাভাবিকতার মোড়কে বাঁধা থাকছে না।

তিনি এই চিন্তা করা থেকে নিরত রাখলেন নিজেকে। বরং মনোযোগ দিলেন তাঁর সামনে বসে থাকা স্বপ্নের নায়কটিকে।

শিমূল বললেন, 'ভাইয়া, মতিউর রহমান সাহেব লিখেছেন, তোমার নিজের নাকি মাঝে-মধ্যে অর্থকষ্ট হতো, তারপরেও তুমি ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের অনেক সাহায্য করেছ।'

তা তো করেইছি–আলতাফ মাহমুদ বললেন।

শিমূল বললেন, 'উনি লিখেছেন, দাঁড়াও, তোমাকে পড়ে শোনাই, মতিউর রহমান সাহেব লিখেছেন, "৬৪ সালে ঢাকা হল সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে (১ মে) তিনি এসেছিলেন। পারিশ্রমিক বাবদ ৫০ টাকার সম্মানী দিয়েছিলাম। সে সময়ের অবস্থায় এ পরিমাণ অর্থ হয়তো তেমন কম ছিল না, কিন্তু আজকে সেদিনের কথা ভাবলে মাথা নিচু হয়ে আসে।"

"না, পঞ্চাশ টাকা কম কী।" আলতাফ মাহমুদ বললেন।

"আচ্ছা কম না। আগে শোনো, উনি আরও কী কী লিখেছেন? সে সময়ে আলতাফ মাহমুদের বেশ অর্থাভাব ছিল। সে খবর অবশ্য আমাদের জানা ছিল না। তখন তিনি থাকতেন আজকের মধুমিতা সিনেমা হলের পেছনে স্টেট ব্যাংক কলোনিতে তাঁর ভাইয়ের বাসায়। তাঁকে পেতে হলে যেতে হতো সকালে। কোনো কোনো সময়ে তাঁর খোঁজে বাসার ভেতরে না ঢুকে কিছুটা ভয়ে দরোজার কাছে দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। জানতাম, ঠিক ৮টার সময় তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন। বের হয়ে এলে, সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে কথা বলতাম। সেখান থেকে তিনি যেতেন গোপীবাগের মোড়ের দেশবন্ধু খাবার দোকানে। পরোটা-ভাজি আর দই খেয়ে চলে যেতেন কোনো স্টুডিও বা অন্যত্র। এ রকম হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেছিলেন তার আর্থিক সমস্যার কথা। বলেছিলেন, 'সামান্য আয়ের জন্য কোনো সিনেমায় গানের সঙ্গে আবহসঙ্গীতে

বেহালা বাজাই। গানের সুর করতে, রিহার্সালে গান শেখাতে গলায় রক্ত চলে আসে। তোমরা কি এসব কথা জানো, বোঝো।' কিন্তু তখন আমাদের তো করার কিছু ছিল না। আমাদের প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে তিনি আসবেন কি আসবেন না, সরাসরি হ্যাঁ বা না বলতেন না। কিন্তু ঠিক সময়েই চলে আসতেন। আমাদের মনে আছে, তাঁকে দেখেছি, ছায়ানটের রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে পেছনের সারিতে বসে শুধু বেহালা বাজাচ্ছেন।

"১৯৬৯ সালের দিকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিটিউট হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সংস্কৃতি সংসদের নামে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠান করেছিল। সে অনুষ্ঠানে গান গেয়ে চলে যাবার সময় সংগঠক আবুল হাসনাতের হাতে ৫০ টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ। বলেছিলেন, "তোমাদের অনেক খরচ হলো।" এ রকম মনের মানুষ, এ রকম বড় শিল্পী আজ কোথায়? আর এ রকম সংগ্রামী শিল্পী, সংস্কৃতিসেবীদের মেহনত ছাড়া কি কোনো দেশের মহান কর্মকাণ্ড সফল হতে পারে?"

আলতাফ মাহমুদ শুনে হাসলেন। মতি বাড়িয়ে লিখেছে। তেমন কিছু করতে পেরেছি বলে তো মনে হয় না।

শিমূল বিস্মিত মুগ্ধতায় তার ঝিলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মানুষটা এত বিনয়ী কেন? নিজের কোনো কাজকেই বড় করে দেখেন না। কোনো স্বার্থত্যাগকেই স্বার্থত্যাগ বলে ভাবেন না। লোকটা কী? মানুষ নাকি আর কিছু!

৯.

ভাইয়া জানো, সবাই কী বলে তোমার সম্পর্কে? তোমাকে নিয়ে অনেক স্মৃতিকথার বই বেরোচ্ছে তো আজকাল। সেসবে একজন কী লিখেছেন? শিমূল বলেন নিজের চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে।

আলতাফ মাহমুদ মিটিমিটি হাসছেন–কী বলে?

'তোমার মনটা ছিল অস্থির। কোনো কিছু করার সাধ হলে কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারত না! হঠাৎ তোমার যদি মুক্তাগাছার মণ্ডা খেতে ইচ্ছা করল, তাহলে তুমি চলে যেতে মুক্তাগাছা।'

'এই মুক্তাগাছার মণ্ডা কি এখনও ভালো আছে?'

'আছে বোধ হয়। সেদিন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, একটা দোকানে এখনও সেরা মণ্ডাটা পাওয়া যায়।'

'তারপর আর কী বলে আমার সম্পর্কে?'

'একদিন নাকি তোমার সাভারের নদীতে গোসল করার ইচ্ছা হয়েছিল আর অমনি তুমি চলে গেলে সাভার। নেমে পড়লে নদীতে। সাঁতার কাটতে লাগলে নদীর জলে। খরস্রোতা নদী। তাও তোমার ভয়ডর নাই। একবার ছুটছ উজানে তো একবার ভাটির দিকে। ইচ্ছামতো সাঁতার শেষে বাসায় ফিরতে ভিজে জামা গায়েই।'

'হ্যাঁ। সাঁতারটা আমার ভীষণ ভালো লাগত জানিস? সেই কীর্তনখোলা নদীতে ছোটবেলায় কত না সাঁতার কেটেছি। সেইসব দিন তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তুই কার কাছে শুনলি এইসব কথা?'

'বললাম না অনেক স্মৃতিকথা এখন প্রকাশিত হচ্ছে। আর তোমার সম্পর্কে যেখানে যা পাওয়া যায় আমি তো মন দিয়ে খুঁটে খুঁটে সব পড়ি। এই তথ্যগুলো আমরা তো জানতামই। বইয়ে উদ্ধৃত করেছে তন্দ্রা ইসলামকে।'

'তন্দ্রা ইসলাম আর কী বলেন আমার সম্পর্কে?' আলতাফ মাহমুদের চোখে-মুখে কৌতূহল।

'উনি বলেন তোমার চেহারা, চুল নাড়া, গান গাওয়ার ভঙ্গি নাকি ছিল কাজি নজরুল ইসলামের মতো।'

'যা। তাই নাকি?'

'কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তোমাকে আরও অনেকেই তুলনা করেছেন।'

'আর কী কী বলে লোকে আমার সম্পর্কে?'

'তুমি তো ছায়ানটের বেহালার শিক ছিলে। বেতন নিতে না। শুধুই পড়াতে। খুব নাকি ভালো টিচার ছিলে তুমি। তুমিই নাকি একমাত্র যে গানের ক্লাসে ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করতে।

১০.

আলতাফ মাহমুদ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে কত মঞ্চে গান গেয়েছি তুই জানিস। ছায়ানাট্য আর নৃত্যনাট্যে নিজেই মঞ্চে উঠে পড়েছি। দে একটা গামছা দে। তোকে দেখাই।

শিমূল কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলবার আগেই একটা তোয়ালে হারমোনিয়ামের দুইপাশের কড়ার সঙ্গে বাঁধা সারা। তারপর গলায় ঝুলিয়ে তিনি বাজাতে লাগলেন। মুহূর্তে সুর ফুটে উঠল, আর আলতাফ মাহমুদ গাইতে লাগলেন,

পদ্মাবতী নিত্য যেত
জল ভরিতে ঘাটে
কলসী কাঁখে স্নান করিতে
সূর্যি যখন পাটে।

সিক্ত সোনার অঙ্গ হেরি
কত না রস ধরি
নিলাজ কুমার জোটে।
সে চাহিয়া না দেখে
সে শুনিয়া না শোনে রে
ও তার মুখেতে হাসিও না ফোটে
সেই পদ্মাবতী।

তারপর নিজের তামাশায় নিজেই হেসে উঠলেন খলখল করে। বললেন, এই গানটা লিখেছিলাম আর সুর করেছিলাম করাচিতে। অনেক বড় গান। একটা রেকর্ডের দুই পাশেই এই একটা গানই ছিল।

তিনি বসলেন। হাঁপাচ্ছেন। দম নিলেন।

হঠাৎ যেন তার মনটা কোথায় চলে গেল। কোন সুদূর অতীতে। বলতে লাগলেন, শিমূল জানিস, আমার নিজের মার মাথাটা ঠিক ছিল না। ছোটমা আমাকে খুব আদর করত। তাকেই আমি নিজের মা বলে জানতাম। গান গাই, ছবি আঁকি, মাদরাসা যাই না, এইসব কারণে বাবা তো মাঝেমধ্যে ভীষণ রেগে

যেতেন। আমাকে ধাওয়া করতেন মারার জন্যে। তখন ছোটমা আমাকে আগলে রাখতেন বাবার বেতের সামনে। সেই স্নেহটা না বড় হওয়ার পরেও ছিল।

আমার নিজের মার মাথাটা...কিন্তু জানিস একবার খুব আশ্চর্য একটা কাণ্ড হয়েছিল। তখন আমি পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদের হয়ে গান গাইতে গেছি বরিশালে। ৫২ সাল কি ৫৪ সালের ঘটনা। ব্যারনস রেস্টুরেন্ট নামে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। আমরা সবাই সেখানে বসে গল্প করছি। আড্ডা মারছি আর কী! এই সময় একটা ঢ্যাঙ্গামতো লোক এসে আমাকে ডাকল–ঝিলু শুইনা যা। আমি তখন গল্পের তালে। বললাম, আসতেছি। তারপর আবার গল্পে মেতে উঠেছি। আমার সঙ্গীদের একজন বলল, আলতাফ, ভদ্রলোক তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে বাইরে গেলাম। বিরক্তি নিয়ে গেলাম, কিন্তু হাসিমুখে ফিরে এলাম। এসেই হাঁক ছাড়লাম, এই সবাইকে একটা করে চপ আরেক টুকরা পুডিং। সবাই হৈহৈ করে উঠল। কী ব্যাপার। তামাশা করছ নাকি। তোমার পকেটে তো সাকুল্যে এক টাকা পাঁচ আনা।

শিমূল বললেন, ভাইয়া, সত্যি তো টাকা টা কোথায় পেলেন?

আরে ওই যে ভদ্রলোক। তাকে মা পাঠিয়েছেন। আমি নাকি শুকিয়ে গেছি। বাবাও নাকি আমার জন্যে আফসোস করছেন। তাই বাসা থেকে মা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ছিল আমার মা।

আলতাফ মাহমুদের গলাটা নরম হয়ে আসে, চোখ ভেজা ভেজা।

শিমূল কিছু বলেন না। ঘোরের মধ্যে আছেন আলতাফ মাহমুদ, সেই ঘোরটা তিনি ভাঙতে চান না।

আলতাফ মাহমুদ বলেন, 'আসলে আমাদের নিজের বাড়িতে তো অভাব ছিল না। কিন্তু ঢাকায় করাচিতে মাঝে-মধ্যে কিন্তু বেশ অভাবে পড়ে যেতাম বুঝলি। আর কষ্টও করেছি। তবে কষ্টটা তখন কষ্ট মনেই হতো না। এমন দিন গেছে রে শিমূল, পকেটে ৫ আনাও থাকত না।

তো সেবার বরিশালে আমরা দুটো নাটক করেছিলাম। আগামী দিন আর দুই পুরুষ। আগামীদিনে একটা গান করতে হতো আমাকে। কোনটা বল তো।

"কোনটা?"

আলতাফ মাহমুদ ফের হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে নিলেন কাঁধে। গাইতে লাগলেন,

"অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন।
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন....

"সুকান্ত!" বলে উঠলেন শিমূল!

"ঠিক তাই!" মাথা নাড়লেন আলতাফ মাহমুদ, তারপর আবার গান ধরলেন,

"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ...

১১.

শিমূল আবারও ভাবে, ভাইয়া কোত্থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, এত গল্পই বা করছেন কেন, শুনছেন কেন?

তাঁর আবারও মনে হয় ১৯৭১ সালেই ঝিলু ভাইয়া মারা গেছেন।

তাহলে?

দুজনেই খানিকক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকেন। তাদের নীরবতার মধ্যভাগ জুড়ে থাকে কামিনী ফুলের দম আটকানো সৌরভ।

এক সময় নীরবতার অবসান ঘটিয়ে শিমূল বললেন, তারপর এলো ১৯৭১ সাল।

আমার ২১ ফেব্রুয়ারির রাতটার কথা মনে আছে। তুমি আমাকে নিয়ে গেলে শহিদ মিনারে। ওখানে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। তারপর তুমি আমাকে বাসায় রেখে বেরিয়ে গেলে।

"মার্চ মাসের অসহযোগ শুরু হলো। আমরা বাড়িতে কালো পতাকা তুললাম।"

"আর তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই অসহযোগ আন্দোলনের নানা কাজ নিয়ে। আজ এখানে জনসভা, কাল ওখানে শ্রমিকসভা। পরশু ছাত্রদের আন্দোলন। তুমি রোজই যাচ্ছ সেইসব মিটিং-মিছিলে, তোমার কণ্ঠে আগুন ঝরানো গানগুলো।"

"৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় শহীদুল্লাহ্ কায়সার একটা গান লিখেছিলেন। আমিই সুর করেছিলাম গানটায়। ওই গানটাও খুব গাইতে হতো। গানটার সুরটা তোকে ধরিয়ে দিই, তোর মনে পড়বে :

আমরা পুবে পশ্চিমে
আকাশে বিদ্যুতে
উত্তরে দক্ষিণে হাসিতে সংগীতে
নদীর কলতানে আমরা
সাগরের গর্জনে চলি অবিরাম
অগ্নি অরে লিখি মোদের নাম।

শিমূল মাথা নাড়ছেন। তার সুরটা পরিচিত মনে হচ্ছে কিন্তু গানের কথাগুলো তিনি ভুলে গেছেন।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, আরেকটা গান খুব গাইতে হতো। পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও খুব বেজেছে গানটা। বল তো কোনটা?

"তুমি কোনটার কথা বলছ ভাইয়া?"

'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা।'

আলতাফ মাহমুদ গান করতে থাকেন, শিমূলও কণ্ঠ মেলায়। যেন তাদের এই প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠস্বর তাড়াবে সকল দেশের সব দুঃশাসন।

'৭ই মার্চে শেখ সাহেব ভাষণ দিলেন। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমাদের রক্তে আগুন লেগে গেল।'

'কী সব আগুনসেঁকা দিনই না ছিল সেসব। তাই না ভাইয়া!'

'হ্যাঁ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বানাল। শেখ সাহেব সেই পতাকা ওড়ালেন। চারদিকে বিদ্রোহ। এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ। গুলি হচ্ছে এখানে সেখানে। বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা। শোনা গেল একটা ছেলে তার বুকের রক্তে নাকি রাজপথে লিখে রেখেছে জয়বাংলা।'

'ভাইয়া, একাত্তরের ২৫শে মার্চের রাতটার কথা মনে আছে তোমার। আমরা তখন র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে রাজারবাগের ৩৭০ নম্বর বাড়িতে উঠে এসেছি। সেও তিন চার বছর হলো।'

'হ্যাঁ মনে আছে। মার্চ মাসের ২৫ তারিখ রাতে ক্র্যাক ডাউন শুরু হলো। সারাদিন শহর জুড়ে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। সব ছাত্র-যুবক দল বেঁধে সেইসব ব্যারিকেড বানাচ্ছে, পাহারা দিচ্ছে। গাছের গুঁড়ি ফেলে, ড্রাম টেনে এনে, টায়ার পুড়িয়ে তারা তাদের অবরোধ জোরদার করে চলেছে। রাতের বেলা পাকিস্তানি মিলিটারি বেরিয়ে পড়ল কামান আর আর্মড কার নিয়ে। সামনে যা পারছে গুলি করছে। বস্তিতে আগুন দিল। ইউনিভার্সিটির হলগুলোতে কামান দাগল। গুলি করে হত্যা করল ছাত্র শিক্ষকদের। কাতারবন্দি করে ছাত্রদের মারল গুলি করে জগন্নাথের মাঠে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা করল তারা।'

শিমুল বলতে লাগলেন, 'আমাদের ওই বাসা থেকে আমরা সব দেখতে পেলাম। গোলার শব্দ, গুলির শব্দ, আকাশে ছোঁড়া আলোবোমায় হঠাৎ হঠাৎ দিন হয়ে ওঠা চারপাশ, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। পানির ট্যাংকে আশ্রয় নেওয়া পুলিশেরা সেদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। পাকিস্তানি মিলিটারি ট্যাংক কামান অটোমেটিক মেশিন গান থেকে গুলি ছুড়ছে, তার প্রতিরোধে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চলেছে বাঙালি পুলিশ। তারাও পাল্টা গুলি ছুড়ছে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে। সমস্ত ছাউনি ওদের পুড়ে ছাই হলো, তখন আশেপাশের

বাড়ি, অফিস, গাছের ওপরে পজিশন নিয়ে মরণপণ প্রতিরোধযুদ্ধে লিপ্ত হলো বাঙালি পুলিশেরা।

আলতাফ মাহমুদ বলতে লাগলেন, 'সারারাত আমরা খাটের নিচে শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে এই বুঝি আমাদের বাড়িতেও আগুন লেগে যায়। দেয়ালে এসে গুলি লাগছে। এই বুঝি এক আধটা এসে বেঁধে আমাদেরও শরীরে। ভোরের দিকে আওয়াজ কমেছে খানিক। আমাদের ঘরে আমি, ঝিনু আর শাওন খাটের নিচে মেঝেতে শুয়ে আছি।

হঠাৎই দরজায় নক।

ভয়ে কারও মুখ থেকে যেন আওয়াজ বেরুবে না।

আমি বললাম, কে?

ঝিনু আমার মুখ চেপে ধরল।

আমরা বাঙালি পুলিশ। দয়া করে দরজা খোলেন।

ঝিনু বলল, খবরদার খুলো না। শাওন ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল।

আমি দরজা খুললাম।

দুইজন পুলিশ এলো। রাইফেলসমেত।

বাঙালি পুলিশ। তারা বলল, আমরা আর পারতেছি না। পালায়া যাবো। আপনারা অস্ত্রগুলান রাখেন। আর আমাদেরকে লুঙ্গি শার্ট যা আছে দেন। আমরা না হইলে ধরা পড়ে যাবো।

আসুন, আসুন ভিতরে আসুন বলে আমি তাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে এলাম।

তাদেরকে লুঙ্গি দিলাম। পাঞ্জাবি দিলাম। চাদর দিলাম। তারা তাড়াতাড়ি ড্রেস বদলালো। পুলিশের সেই পোশাক আমরা কোথায় লুকিয়ে রাখব, তাই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু তারা আরও বড় চিন্তার খোরাক দিল, বলল, আমরা যাই। আমাদের হাতিয়ার দুইটা ঠিকমতো রাইখা দিয়েন। আমাদের অনেক অস্ত্র লাগব সামনে। সামনে অনেক যুদ্ধ করতে হইব। তারা তাদের হাতের রাইফেল আমার হাতে তুলে দিল। আমি বললাম, চিন্তা করবেন না। সংগ্রাম পরিষদের ছেলেদের হাতে দিব ওগুলো। আপনারা একটু বসুন। ঝিনু নাশতা আনতে গেছে।

ওরা বলল, না সময় নাই। বাঁইচা থাকলে বহুত নাশতা করনের সময় পাওয়া যাইব। পুরা পুলিশ লাইন ছারখার। খালি লাশ আর লাশ। মর্টার দিয়া গোলা ছুড়ছে। আগুন লাগায়া দিছে। পানির ট্যাংকে যারা নামছে তারা সেদ্ধ হইয়া মারা গেছে...

তারা দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ঝিনু এলো নাশতা নিয়ে। বলল, কই ওনারা।

আমি বললাম, চলে গেছে।

হ্যাঁ। ওরা চলে গেল। আর তোমাকে আমাকে সবাইকে চিরদিনের জন্যে মক্তিযুদ্ধের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল–শিমূল বললেন।

ওরা চুপচাপ বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

যেন ২৫ মার্চের সেই গণহত্যার রাত, সেই রাজারবাগ পুলিশের প্রথম ছোঁড়া প্রতিরোধের গুলির মাধ্যমে আপনা আপনিই শুরু হয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধ, সেই লাশের সারি, লাশ আর লাশ, সমস্ত ঢাকা তখন লাশের শহর, বস্তিপোড়া আগুনে ঝলসানো লাশ, কামান দাগিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া ছাত্রাবাসে পড়ে থাকা ছাত্রের লাশ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হত্যা করা শিকদের লাশ, জগন্নাথ হলে লাইন করে গুলি করে হত্যা করা ছাত্র শিক্ষকের লাশ তাদের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

১২.

তারপর একসময় শিমূল বললেন, "আমাদের ওই বাসায় না জহির রায়হান আসতেন। আনোয়ার হোসেন, রাজ্জাক, নারায়ণ ঘোষ। ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন, গাজিউল হক, কামাল লোহানি।"

আলতাফ মাহমুদ বললেন, সেটা তো ২৫ মার্চের আগে। ২৫ মার্চের পর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ২৭ তারিখে বাসার ছাদের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেললাম।

২৮ তারিখে কারফিউয়ে ব্রেক দিলে আমরা চলে গেলাম খিলগাঁও। মে মাসে আবার চলে আসি রাজারবাগের বাসায়।"

শিমুল বললেন, "তুমি না স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্যে অনেক গান করে দিয়েছিলে। গোপনে গান লিখিয়ে নিয়ে সুর করে স্টুডিওতে রেকর্ড করে রাখতে। মেলাঘর ক্যাম্প থেকে আগরতলা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আসত। তুমি তাদের কাছে সেইসব স্পুল দিয়ে দিতে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সেইসব গান প্রচার করা হতো।"

আলতাফ মাহমুদ বললেন,"হ্যাঁ। তা তো হতোই। শাহাদত চৌধুরী আসত, গাজি দস্তগীর, হাবিবুল আলম, ফতেহ, বাকের।"

শিমূল বড় একটা শ্বাস টেনে বললেন, "আর আমাদের বাসাটা ছিল একটা দুর্গ।"

আলতাফ মাহমুদ বললেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা আসত। এটা ওটা দিত।

ওরা বলত, আমাদের জন্যে কষ্ট করলেন।

আমি বলতাম, কষ্ট কী। তোমাদের যখন যা সাহায্য লাগবে বলবে। আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে করব। তোমরা হলে মুক্তিযোদ্ধা। তোমাদের জন্যে করব না। কী বলো।

ওরা বলত, আমরা আসি তাহলে।

আমি বলতাম, না। ভেতরে আসো। একটু ভাত খেয়ে নাও। নতুন গান রেকর্ড করা আছে, নিয়ে যাও। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমার গান তোমরা শোনো না?

ওরা বলত, আপনার নাম তো বলে না।

না। এখনও এপারে আছি তো। তাই বলে না। জহির রায়হান খবর দিয়েছে। ওই পারে চলে যাবো। তারপর নিজের নামেই গান বাজাব স্বাধীন বাংলা বেতারে।

শিমুল বললেন, ইস সেই যাওয়াটা যদি যেতেন। তাহলে তো আর আপনি ধরা পড়েন না।

১৩.
আবার নীরবতা নেমে এলো এই ঘরে। দুজনেই চুপ করে রইলেন।

শিমূল বললেন, ২৫শে মার্চের পরে তোমার ব্যস্ততা যেন আরও বেড়ে গেল। কী করো, কোথায় যাও কোনো খোঁজ খবরই নাই। এর মধ্যে গণসংগীত শিল্পী আবদুল লতিফ ভাই , যন্ত্রশিল্পী হাফিজ ভাই, রবীন্দ্রসংগীতের আতিকুল ইসলাম, নৃত্যশিল্পী আমানুল হক যদি বাসায় আসতেন, তাহলে তো তোমরা দরজা বন্ধ করে দিতে। আমাদের আর কোনো অ্যাক্সেসই থাকত না সেই ঘরে। হাফিজ ভাইও তোমার মতো শহিদ হয়ে গেলেন।

শিমূলের চোখে জল টলমল করে।

তিনি বলে চলেন, 'বাড়িতে কী হচ্ছিল, আমরা জানতাম না ভাইয়া। তবু আঁচ করতে পারতাম। আমি, ঝিনু আপা। হাফিজ ভাই আসতেন গাড়ি চালিয়ে। হর্ন দেবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দৌড়ে বাইরে যেতে। যে অবস্থাতেই থাকো না কেন একদম দেরি করতে না। গেটের পাশে কাঁঠাল গাছতলায় দুইজন কথা বলতে। আবদুল লতিফ ভাই তো আমাদের বাসাতে বসেই গান লিখতেন। তোমাকে সেই গান লেখা কাগজ দিয়ে বলতেন, সুর দেওয়া হয়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলবে। তুমিও তো তখন কিছু গান লিখেছিলে। তাই না ভাইয়া।'

'হ্যাঁ লিখেছিলাম।'

'মিউজিক হ্যান্ডস জোগাড় করতেন হাফিজ ভাই আর রাজা হোসেন খান। তুমি তো ঘুরে ঘুরে শিল্পী জোগাড় করতে। তাই না! কোথায় তোমাদের গানের রিহার্সাল হতো বলো তো! কোথায় রেকর্ডিং হতো!'

আলতাফ মাহমুদ বললেন, বেঙ্গল স্টুডিও আর এফডিসি স্টুডিওতে আমরা গান রেকর্ড করেছি।

'তোমার একটা গানের রেকর্ড নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত পাড়ি দেবার সময় একবার ধরা পড়েছিল। তারপর থেকেই তুমি খুব চিন্তিত ছিলে। হয়তো ওই গানের সুরকারকে ওরা সনাক্ত করতে পেরেছিল। হয়তো সেকারণেই তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে যায়।'

আলতাফ মাহমুদ বলেন, মিনুর পায়ে যে একদিন প্লাস্টার বেঁধেছিলাম, তোর মনে আছে?

'হ্যাঁ মনে আছে। মিনু আপা তখন বুলবুল ললিত কলা একাডেমিতে নাচের শিল্পী। পাকিস্তানি সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে ঢাকায় গানবাজনার আসর বসবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মেহেদি হাসান আর নূরজাহানও এসেছেন। সেই অনুষ্ঠানে নাচতে বলা হয়েছে বাফার শিল্পীদের। সেই খবর নিয়ে বাসায় এসেছেন আতিক ভাই। তখন তোমরা মিনু আপাকে নিয়ে গেলে একটা হাসপাতালে। পায়ে প্লাস্টার বেঁধে নিয়ে এলে গাড়ি করে। তারপর তাকে ধরাধরি করে বাসায় বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। আমরা খুবই ভয় পেয়ে গেলাম মিনুর আবার কী হলো। মা তো বার বার করে জিজ্ঞেস করছে, আলতু, আমার মিনুর কী হয়েছে।

আলতাফ মাহমুদ বললেন, শিমূল, বহুদিন পরে তোর মুখে আমার আলতু নামটা শুনলাম।

শিমূলকে তখন গল্পে পেয়েছে। তিনি বললেন, 'তুমি কিন্তু মাকে প্রথমে কিছুই বলোনি। পরে খুলে বললে সব। সন্ধ্যায় ঠিকই একজন ক্যাপ্টেন বাসায় এলো। মিনুর পা ভাঙা দেখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেল। তারপর ঠিক হলো, মিনুকে আর এইপারে রাখা ঠিক হবে না। ও আর সেজভাই মেওয়া বিল্লাহ চলে গেল আগরতলা বর্ডার পেরিয়ে মেলাঘরে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। মিনু সেখানে বাংলাদেশ হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার কাজ নিল। আর সুফিয়া কামাল খালাম্মার দুই মেয়ে লুলু আর টুলুও একই হাসপাতালে যোগ দিল।'

'তোর এত কথা মনে আছে কী করে?'

'সত্যি বলব ভাইয়া। এইসব কথা এতবার করে গল্প শুনেছি, এতবার এত বইয়ে পড়েছি, কোনটা আমার নিজের চোখে দেখা আর কোনটা তোমার মুখে বা ভাইয়াদের মুখে বা নাসিরউদ্দিন ইউসুফের মুখে শোনা আর আলাদাই করতে পারি না।

ওদের মুখে শুনে শুনে ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফকে তো আমাদেরও হিরো মনে হয়।'

'হ্যাঁ, দুই নম্বর সেক্টরের আরবান গেরিলাদের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল।'

'সে তো আমরা বুঝতামই ভাইয়া। আমাদের বাড়িটা বাইরে থেকে ঠিকই আছে। কিন্তু হঠাৎই বাড়িতে কলাওয়ালা শাকসব্জিওয়ালা পুরোনো খবরের কাগজওয়ালাদের আনাগোনা বেড়ে গেল। ওরা এলেই তুমি ওদের ডেকে নিয়ে যেতে বাড়ির পেছনে। ফিসফিসিয়ে কী সব গল্প করতে। পরে আমরা বুঝতে পারলাম, এরা হকার নয়, এরা মুক্তিযোদ্ধা। শাকসব্জির আড়ালে আসত লিফলেট। তারপর আসতে লাগল অস্ত্র।'

'হ্যাঁ। সেই সব অস্ত্র, আমাদের বাসায় রাখা, আজাদদের বাসায় রাখা, আরও

আরও বাড়িতে রাখা, সেইসব অস্ত্র দিয়ে ঢাকায় শুরু হলো গেরিলা অভিযান। একটার পর একটা। পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের সামনে আমাদের হাফিজ তো একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারল একদিন। ফার্মগেট এলাকায় আর্মি চেকপোস্ট আক্রমণ করল গেরিলারা, দিনে দুপুরে। আমেরিকান তথ্য কেন্দ্রে বোমা হামলা করল। ডিআইটির টেলিভিশন ভবন, ওয়াপদা ভবন, পেট্রল পাম্প, আজিমপুর গার্লস স্কুলের পাশের সেনাপোস্টে হামলা—চারদিকে এত আক্রমণ। পাকিস্তানি মিলিটারির তো ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা, ক্রাক প্লাটুন বা আরবান গেরিলা নামে যারা পরিচিত ছিল, তারা ঢাকা শহরটাকে পাকিস্তানি মিলিটারিদের জন্যে এক দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

'হাফিজ, সামাদ ওরা ঠিক করল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে কেনেডি যখন আসবে তখন ওর ভেতরে বোমা ফাটানো হবে। সামাদের নিয়ন সাইনের একটা কন্ট্রাক্টরি কাজ ছিল কন্টিনেন্টালের সঙ্গে। মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন সাইনের ভেতরে ভরে সে সব নিয়ে গেল কন্টিনেন্টালের ভেতরে। কিন্তু কেনেডি এলো না আর। তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বিদেশি প্রতিনিধি দল আছে ওই হোটেলে আছে অনেক বিদেশি সাংবাদিক। হোটেলের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরণ ঘটালে সেটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল বিদেশি সাংবাদিকদের কল্যাণে। কিন্তু আরেকটা মুশকিল হলো। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে। এগুলো এখন রাখা হবে কোথায়। আমি বললাম, আমাদের বাসার পেছনে রাখা যাবে। আমার কালো অস্টিন গাড়ির পেছনে অস্ত্র ভরে নিয়ে এলাম বাসায়।'

শিমূল বললেন, "সারারাত ধরে আমার ৫ ভাই, তুমি, সামাদ ভাই, হাফিজ ভাই, পাশের বাসার টুকু ভাই, নাসের ভাই সবাই মিলে কাঁঠাল গাছের নিচে একটা গর্তে পুঁতে রাখলে। তারপর মাটিচাপা দিয়ে ওপরে ভাঙা ইট বালু আর ভাঙা কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখলে তোমরা।"

১৪.

শিমূলের দিকে যেন একটা রোমশ অন্ধকার তেড়ে আসছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আর কিছু নয়, স্মৃতি। কারণ তার মনে পড়ছে সেই ভোরবেলাকার কথা, যখন আলতাফ মাহমুদ ধরা পড়লেন।

শিমূল যেন সেই স্মৃতিটা কিছুতেই মনে করতে চান না।

কিন্তু আলতাফ মাহমুদই সেই প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। অনেকক্ষণ উদাস ভঙ্গিতে বসে থেকে আলতাফ মাহমুদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার ধরা পড়ার দিনটা মনে আছে তোর শিমূল?

শিমুল বললেন, হ্যাঁ। মনে আছে। ওই দিনটা কি ভুলবার মতো? ভোরবেলা। মা নামাজ শেষে তসবিহ্ গুনছেন। আমি রেওয়াজ করছি। ৩০ শে আগস্টের ভোরবেলা। ১৯৭১ সাল।

পাশের ঘরে ঝিনুর কোলের পাশে শুয়ে আছে শাওন। ৩ বছরের। তার পাশে তুমি শুয়ে আছ।

ছোট্ট শাওন কেঁদে ওঠে।

মা বললেন, শিমুল শিমুল।

আমি রেওয়াজ থামিয়ে বললাম, জি মা।

মা জায়নামাজে বসেই বললেন, দ্যাখ তো শাওন কাঁদে কেন।

আমি তোমাদের ঘরে যাই। শাওনকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ঝিনুপা বলে, তুই আবার রেওয়াজ ছেড়ে আসলি কেন। আমিই তো জেগে আছি।

আমি বলি, থাকো জেগে। আমি তো ওর খালা নই। আমি ওর মা।

তুমি বললে, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি তো হবেই।

শাওন কান্না থামিয়ে বলে, আমি মা বাবার মাঝখানে শোবো।

আমি বলি, ওরে পাজি মেয়ে।

আমি শাওনকে তোমার আর আপার মাঝখানে শুইয়ে দেই।

তারপর আবার আসি বৈঠকখানায়।

এস্রাজটা কোলে তুলে নিয়ে আরেকবার তান ধরি।

একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। দুই ট্রাক বোঝাই পাকিস্তানি সৈন্য।

কাক ডেকে ওঠে তারস্বরে।

আমি বুটের আওয়াজ পাই।

মা চমকে ওঠেন।

শিমুল উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। বুঝি পুরো বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে।

আমি বলি, মা মিলিটারি।

মা তার বিশ্বাসের প্রতীক কোরআন শরিফে হাত রাখেন।

সৈন্যরা বারান্দার নেটের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে বারান্দায়। মা দৌড়ে যান, সবাইকে ডাকতে থাকেন।

তুমি আতঙ্কিত কণ্ঠে বলো, বাড়িতে এতগুলা পুরুষ মানুষ। লিনু, খনু, দিনু, নুহেল, মিউজিশিয়ান হাফিজ...আর্টিস্ট আবুল বারক আলভি....

তোমার গায়ে তখন একটা সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি, আর পরনে একটা লুঙ্গি।

তুমি বেরিয়ে এলে। মা ঝুনুপাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না। কারণ ও তো সুন্দরী। শাওনের বয়স তিন, ও আর্মিদের দেখে বমি করতে আরম্ভ করেছে।

আপা বলল, কই যাও।

তুমি বলেছিলে, আমাকে উঠতে হবে ঝিনু। আমাকে না পেলে ওরা তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। এতগুলো ছেলে আছে, সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। আর তুমি তো জানো, একবার গেলে কেউ আর ফেরে না।

ওরা ততক্ষণে নেটের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তারা ধাতবকণ্ঠে বলে, মিউজিক ডিরেক্টার সাব কৌন হ্যায়? কিধার হ্যায়?

তুমি অকুতোভয় কণ্ঠে বললে, আমি।

হয়্যার আর দি আর্মস এন্ড অ্যামুনিশন্স। হাতিয়ার কিধার হ্যায়। তোমাকে ততক্ষণে কয়েকজন সৈন্য ঘিরে ধরেছে। একজন তোমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে মারতে মারতে সামনের বারান্দায় নিয়ে যায়।

তারপর এক এক করে আমার আরও চার ভাই আর আলভি মামা (আবুল বারক আলভি) আর যারা ছিল সবাইকে ধরে নিয়ে বাইরে এক লাইনে দাঁড় করায়।

তুমি বুঝে নিলে তোমার কর্তব্য, দায়দায়িত্ব তোমাকেই স্বীকার করতে হবে, তাই তুমি বললে, তোমরা কেন এসেছো আমি বুঝতে পারছি। আমি ছাড়া আর

কেউ জানে না। এসো। এই গাছের নিচে আছে দুটো ট্রাংক।

মিলিটারিরা বলল, ব্রিং আস আ স্পেড।

তুমি বললে, কোদাল চাচ্ছ। সেটাও উঠানেই আছে।

মিলিটারিরা তাকে অস্ত্রের মুখে কোদালের কাছে নিয়ে যায়।

তারা বলে, ডিগ আউট দি আর্মস। ডিগ।

তুমি কোদাল চালাতে শুরু করলে। আমি সব দেখতে পাচ্ছিলাম। তোমাকে ওরা রাইফেলের বাট দিয়ে মারছিল।

একজন মিলিটারি তোমার মুখে রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মারেঃ জলদি হাত চালাও। তোমার একটা দাঁত খুলে মাটিতে পড়ে যায়।

আর কাক ডাকতে থাকে কা কা কা।

তুমি আবার খুঁড়তে থাকো মাটি। তোমার মুখ দিয়ে রক্তের স্রোত নামে।

কোদাল দিয়ে খুঁড়ে চলেছ আঙিনা। মাটিতে তোমার দাঁত পড়ে আছে। তোমার ক্লান্তি লাগে। তোমার মনে হয় অনিচ্ছা জাগে। তোমার হাত আবার শিথিল হয়ে আসে। বেয়নেট চার্জ করে ওরা তোমার কপালে। তোমার কপাল থেকে চামড়া কেটে চোখের ওপরে ঝুলে পড়ে। ওমা...

মাটি খুঁড়ে দুটো ট্রাংক তোলো তুমি। দড়ি দিয়ে বেঁধে ওঠাতে হয় ট্রাংক দুটো। অস্ত্র বোঝাই ট্রাংক। সেই দড়ি দিয়েই এবার তোমাকে বাঁধে মিলিটারিরা পিঠমোড়া করে। সমস্ত শরীর লুঙ্গি, গেঞ্জি কাদায় মাখামাখি। মা ঘরের ভেতর থেকে তোমাকে একটা শার্ট দিতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না।

তোমাকে, লিনু, খিনু, নুহেল, দিনু ...আমার ভাইদেরকে... আবুল বারক আলভী ভাইকে...হাফিজ ভাইকে...পাশের বাড়ির আরো দু যুবককে ওরা ধরে নিয়ে যায়। তোমাকে ওরা নিয়ে যায় আমারই সামনে দিয়ে। আমি পাশের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো। তোমার রক্তাক্ত অবয়ব নিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ আমার দিক দিয়ে। তুমি যেন আমাকে দেখে একটু থামলে। কী বলতে চেয়েছিলে ভাইয়া।

ভাইয়া, আমার বাবা মারা যান ৬১ সালে। ঝিনু আপা (ঝিনুক, সারা বিল্লাহ পরে সারা মাহমুদ)-এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো ৬৬ সালে। তার আগে থেকেই তো তুমি আমাদের বাসায় যাওয়া আসা করো। তোমার বিশাল ব্যক্তিত্বের কী যে জাদুকরি আকর্ষণ ছিল। তোমাকে বলা হয়নি ভাইয়া, তুমি আমার দুলাভাই ছিলে না, তুমি আমার পিতা ছিলে, বন্ধু ছিলে, বড় ভাই ছিলে। আর ছিলে শিক। যখন গান শেখাতে তখন কী যে কড়া মাস্টারমশাইই না ছিলে তুমি।

তোমাকে ওরা তোলে একটা সাদা টয়োটা গাড়িতে।

তোমাদের ধরে নিয়ে গেল ৩০ আগস্ট।

১ লা সেপ্টেম্বর ভাই ৪ জন আর আলভি মামা ফিরে এলেন। তুমি আর এলে না। মিউজিশিয়ান হাফিজ ভাই ফিরল না। ভাইদের কাছে শুনেছি, রুমি, বদি, জুয়েল, আজাদ–এদের নাম। এরাও আর কোনোদিন ফিরে আসেনি।

তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী পড়ে রইল। তোমার তিন বছরের মেয়ে শাওন নির্বাক হয়ে সব কিছু দেখল। আমাদের মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর ঝিনু আর মা আর আমি নিঃশব্দে বসে অশ্রুপাত করি।

শাওন বলে, বাবা কই। বাবা কেন আসে না। আমরা সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

১৫.

শিমূলকে যেন কথায় পেয়েছে। শিমূল বলে চলেন, তোমাকে নাকি ভাইয়া ওরা খুব অত্যাচার করেছিল। এক সঙ্গে ধরা পড়েছিলে ৩২ জন। দিনের বেলায় তোমাদের ওপর জিজ্ঞাসাবাদের নামে অত্যাচার চলত ড্রাম ফ্যাক্টরিতে। একটা ৬ ফিট বাই ৪ ফিট রুমে তোমাদের রেখেছিল গাদাগাদি করে। সেখান থেকে একজন একজন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ওপরে চালানো হতো অকথ্য অত্যাচার। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তোমরা যখন পানি চাইতে তোমাদের দেওয়া হতো বুটের লাথি। রাতে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হতো রমনা থানায়।

এক তারিখ দুপুরে ড্রাম ফ্যাক্টরির বারান্দায় হেলান দিয়ে বসেছিলে তুমি। শারীরিক নির্যাতনে তোমার শরীর বিভৎস হয়ে গিয়েছিল। তোমাদেরকে ওরা নাকি ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে ঘোরাত। একটু নাকি তোমাদেরকে লাইন করে দাঁড় করিয়েছিল গুলি করে মারবে বলে। একজন পাকিস্তানি আর্মি বলেছে, এই কাফেরদের জন্যে গুলি খরচ করা যাবে না। এদের হাতে পায়ে ইট বেঁধে পানিতে ফেলে দিতে হবে।

আমার ভাইদের ছেড়ে দেওয়া হলো। আলভী মামাকেও। আলভী মামা বুদ্ধি করে নিজের নাম পাল্টে বলেছিলেন বলে বেঁচে যান। আর আমার ভাইদের বাঁচানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নাও তুমি। ভাইয়াদের শিখিয়ে দিতে একটা কথাই বলতে, আমরা কিছু জানি না। আর তুমি বললে, সব কিছু করেছ তুমি একা।

হয়তো তোমার অপরাধের পাল্লা অনেক ভারি ছিল। তুমি আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির সুরকার। এই সুর তো পাকিস্তানিদের বুক এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেয় প্রতিবার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। এক কোটি বুলেটের চেয়েও এই সুর বেশি ল্যভেদি। তুমি বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে ছিলে সব সময়। তোমার গান ছিল তোমার অস্ত্র। আর তুমি গানে সুর করে গেয়ে রেকর্ড করে পাঠিয়েছ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। কাজেই তোমাকে ওরা ছাড়ত না।

কিন্তু ভাইয়াদের ছেড়ে দিল। আমার সেজ ভাইয়ার হাতে তুমি তোমার এনগেজমেন্ট রিং দিয়ে বললে, 'শাওন আর ঝিনুককে দেখে রেখো। ওরা বড় একা হয়ে গেল।'

এই ছিল ভাইয়াদের কাছে তোমার শেষ কথা। তারপর কী হলো, আমরা জানি না। তুমি জানো।

ওরা নাকি যাকে যেদিন মারতে নিয়ে যেত, সেদিন বিরিয়ানি খেতে দিত। ওই বিরিয়ানির প্যাকেট এলে শেষের দিকে তোমরা বুঝতে পারতে মৃত্যু আসন্ন। মুক্তিযোদ্ধা বদি ভাই নাকি শারীরিক নিপীড়ণ সইতে না পেরে ইলেক্ট্রিক তার কামড়ে ধরেছিল। আজাদ ভাই নাকি ভাত খেতে চেয়েছিল তার মার কাছে। মা ভাত নিয়ে গিয়ে দেখেন ছেলে নেই। এই ছেলে আর কোনোদিন ফিরে আসেনি আর এই মা আর কোনোদিনও ভাত খাননি।

শিমুল কাঁদে। সেই ঘটনার ৩৬ বছর পরেও তার কান্না শুকায় না।

১৬.

শিমূল বলেন, ভাইয়া তোমার কথা ছিল ঝিনু আপা, শাওন, মা, আর আমাদের সবাইকে গ্রামে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তুমি চলে যাবে সীমান্তের ওই পারে। সেপ্টেম্বরে তোমার যাওয়ার কথা ছিল মেলাঘরে। কিন্তু সেই সেপ্টেম্বর আর এলো না। ৩০ শে আগস্টেই ধরা পড়লে তুমি। তারপর...

আমার ভাইরাও ধরা পড়েছিল। ওরা ফিরে এলো। তুমি এলে না। আলতু তুমি ফিরে এলে না। ঝিলু ভাইয়া তুমি ফিরে এলে না। তোমার ঝিনুক কতদিন অপেক্ষা করে থাকল। তোমার শাওন...

আমার মাও তোমার শোকে বিছানা নিলেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

১৭.

আলতাফ মাহমুদ বলেন, দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। নারে?

শিমুল বলে, হ্যাঁ। ১৬ ডিসেম্বরেই পাকিস্তানি বাহিনী সারেন্ডার করল। নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুরা ঢুকে পড়ল ঢাকায়। ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েই পাকিস্তানিরা ভুল করল। মুক্তিবাহিনী আর মিত্র বাহিনী। পাকিস্তানিরা কি আর পারে?

বিজয়ের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইয়ারা ছুটতে লাগল যে যেদিকে পারে, তোমার খোঁজে। সব হাসপাতাল, জেলখানা, জেল হাসপাতাল, ক্যান্টনমেন্টের যেসব জায়গায় মাটির নিচের কুঠুরিতে বন্দিদের রাখা হতো সব জায়গাতেই খোঁজ চলল তোমার। তোমাদের। জাহানারা ইমাম খুঁজে ফিরলেন রুমিকে। আজাদের মা আজাদকে। জুয়েলের মা জুয়েলকে। কাউকেই আর পাওয়া গেল না।

তোমাকে কীভাবে মেরেছিল ওরা। পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে? পানিতে ডুবিয়ে?

ভাইয়া তোমার বাবা তোমাকে মাদরাসায় দিয়েছিলেন ছোটবেলায়। তুমি খুব সুন্দর করে কোরআন শরিফ পড়তে পারতে।

ভাইয়া, মৃত্যুর আগে কি ওরা তোমাকে পরিষ্কার হতে দিয়েছিল যাতে তুমি...

ভাইয়া, মার মৃত্যুর পর তাকে যখন ভাইয়ারা কবর দিয়ে এলো তখন শাওন বলেছিল, তোমাদের মায়ের তো কবর আছে। আমার বাবার কবর কোথায়?

১৮.

আলতাফ মাহমুদ হারমোনিয়ামের রিডে হাত রেখে বললেন, শিমূল, দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন। তাই না?

জি ভাইয়া।

বঙ্গবন্ধু কী করছেন এখন?

ওনাকে তো হত্যা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক তাকে মেরে ফেলে। শুধু তাকে নয়...তার পরিবারের সবাইকেই প্রায়... তার স্ত্রী, তার তিন ছেলে কামাল জামাল এমনকি ছোট্ট রাসেলকে...তার দুই পুত্রবধূ, একজন প্রেগনান্ট ছিল, তার ভাই...অনেক অনেক...আপনি বনানী কবরস্থানে যান, দেখবেন কত বড় কবরের সারি...

কী বলিস!

খানিকণ নীরব থেকে আলতাফ মাহমুদ আবার বললেন, 'আচ্ছা খালেদ মোশাররফের খবর কী?'

'মেলাঘরের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে উনি তো ছিলেন হিরো।

উনিও মারা গেছেন। সেনাবাহিনীর ভেতরের গোলযোগে। ১৯৭৫ থেকে ৮১ অনেক কিছু হয়েছিল। অনেক ক্যু–পাল্টা ক্যু।'

'জিয়াউর রহমান? উনি না কালুরঘাট রেডিও থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?'

'উনিও নাই। ওনাকেও হত্যা করা হয়েছে ৮১ সালে।'

'কর্নেল তাহের এখন কী করছেন?'

'ওনাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে আহত এক সৈনিককে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে।'

'কে আছে আর মুক্তিযোদ্ধাদের?'

'কেউ নাই। কেউ নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আগে ডিসেম্বরে আলবদর বাহিনী আর পাকিস্তানি বাহিনী অনেক প্রিয় মানুষকে হত্যা করে। শহিদুল্লাহ কায়সার, মুনির চৌধুরী, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী, সাংবাদিক সেলিনা পারভিন ...এক হাজারেরও ওপরে শুধু বুদ্ধিজীবীই হত্যা করেছে রাজাকার আলবদররা...

'স্বাধীন দেশে এই হত্যাকান্ডের বিচার হয় নাই...আলবদরদের...?'

'না। হয় নাই।'

'শিমূল। তুই বলেছিলি ওরা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কী অত্যাচার করেছিল? কিছুটা বর্ণনা তুই দিয়েছিস কিছুটা দিসনি।

পা ওপরে মাথা নিচু করে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়েছে, হাতের আঙুলে সুই ঢুকিয়েছে, প্রতিটা আঙুলের নখ তুলে নিয়েছে, গরম পানিতে মাথা চুবিয়েছে...

চড়, লাথি, গুড়ি লাঠির বাড়ি, মেঝেতে শুইয়ে পুরো শরীর বুট দিয়ে পাড়ানো... কত অত্যাচার কত কষ্ট...

কিন্তু সেইসব কষ্ট তো আমাদের বুকে বাজে নাই....

কারণ আমরা জানতাম দেশ স্বাধীন হচ্ছে। তোরা সব ভালো থাকবি।

কিন্তু তোর মুখে যা শুনলাম, তার পরে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার বুক ব্লেড দিয়ে চিরে চিরে কলজেটাকেই কেউ ফালা ফালা করে ফেলছে...

আচ্ছা সাধারণ মানুষ কেমন আছে। মানুষ দুইবেলা খেতে পায় তো। শান্তিতে ঘুমাতে পারে তো!'

'দেশের কিছুই উন্নতি যে হয় নাই তা বলব না। অভাব কমেছে। কিন্তু এখনও কোটি কোটি মানুষ চরম গরিব। দুইবেলা পেট পুরে খেতে পায় না।'

'বাংলার হিন্দু বাংলার মুসলমান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খৃস্টান মিলে মিশে আছে তো?'

'আছে। মানুষ তো এইদেশে সব সময়ই শান্তিতে সম্প্রীতিতে পাশাপাশি থাকত। কিন্তু শাসকেরা তো সেটা চায় না। তারা লুটপাট করতে চায়। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। এই দেশে এখন জঙ্গি দেখা দিয়েছে। তারা বোমা মারে। তারা পহেলা বৈশাখে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা মারে। তোমার প্রিয় সংগঠন উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা মেরেছে। তারা সিনেমা হলে বোমা মারে। যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা মারে...

'না শিমুল আমি আর শুনতে চাই না। তুই কিছু ভালো কথা বল। আশার কথা বল। যেন মনে না হয় আমাদের এই আত্মত্যাগ বৃথা যায় নাই?'

'কোটি কোটি ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে। ক্রিকেটে। ওয়ানডে নামের একটা খেলা চালু হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারতের মতো দেশকে একবার করে হারিয়েছে... ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে...প্রফেসর ইউনুস আর তাঁর গ্রামীণ ব্যাংক শান্তির জন্যে নোবেল পেয়েছেন...সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে ভালো করছে...

আর একটা কথা তোমাকে আমি বলতে পারি। এখনও গান গাওয়ার ওপরে

বাধা আছে। তবে কম। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে যাওয়া নিয়ে কথা আছে। তবে কম। এখনও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও তোমার ওই গানটা আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা আর তোমার সুর করা, ওইটা এখনও রয়ে গেছে।

যতদিন এই বাংলার আকাশ থাকবে, এই বাংলার বাতাস থাকবে, নদী থাকবে, ফুল ফল মাটি থাকবে, একজনও বাঙালি থাকবে ততদিন তোমার ওই গানটা থাকবে...

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি?
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি॥

জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশিখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তি লগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না না না না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারী।

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাতজাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসেঃ
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো॥

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলী করে ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী॥

আলতাফ মাহমুদ আর শিমূল মিলে গলা ছেড়ে এই গানটা গাইতে থাকেন। তখন এই ঘর, ঘরের আসবাব, এই ভবন, ভবনের ছাদ, দরজা-জানালা, সব কিছু যেন মোমের আলোর মতো জ্বলতে থাকে, পুড়তে থাকে, যেন সব কিছুতে এক অপার্থিব শোক আর শ্রদ্ধা এসে মেশে, যেন ঘড়ির কাঁটাও থেমে যায়।

১৯.

শিমূল বলেন, ভাইয়া। এত কিছু জিজ্ঞেস করলে। তোমার স্ত্রী আমার বোন ঝিনু কেমন আছে। তোমার মেয়ে আমার ভাগ্নি শাওন কেমন আছে জানতে চাইলেন না?

আলতাফ লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ও তাই তো। ও তাই তো। ওরা কেমন আছে।

তুমি আগের মতোই রয়ে গেছো ভাইয়া। দেশ দেশ করে নিজের বউ বাচ্চার খবর রাখতে ভুলে যাও! তুমি বসো। আমি আপাকে খবর দেই। ওরা আসুক। তোমার সঙ্গে দেখা করুক।

বাচ্চুকে তুই বিয়ে করেছিস বললি। বাচ্চুকেও ডাক।

ডাকছি।

শাওন অনেক বড় হয়েছে নারে?

নিশ্চয়। তোমার সমান হয়ে গেছে।

ও কি আমার কথা কিছু বলে?

বলবে না কেন। গত ৩৫টা বছর ধরে বলছে। কতদিন ও তুমি এসেছ ভেবে দৌড়ে গেছে দরজায় বাবা বাবা বলে ডেকে ডেকে। ও কতদিন বলেছে, খালামনি, আমি ভাবি কি জানো, বাবা মারা যায়নি, কোনো একদিন ঠিকই এসে হাজির হবে, বলবে ছাড়া পেয়ে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজ পেয়েছি, এলাম। ও তোমার জন্যে গর্বিত। তার বাবার জন্যে গর্বিত। আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে গর্বিত ভাইয়া। শাওন তো করবেই গৌরব। ও যে তোমার মেয়ে। আর আমার ঝিনু আপা কত কষ্ট করল। তবু তোমাকে নিয়ে তিনিও গৌরব করেন। আরে পুরো দেশ তোমাকে নিয়ে আজ কত বড়মুখ। তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছ। তুমি বাংলাদেশকে বাংলাভাষাকে একটা গান দিয়েছ। যেইগান সমস্ত বাঙালির মনের সুর। প্রাণের সুর। শাওনের ছেলের স্কুলে যদি কিছু লিখতে দেয়, শাওন বলে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখ, এই দেশের সব শিশু জানুক মুক্তিযুদ্ধের কথা, গেরিলাদের কথা, আমাদের বাবাদের সাহসের কথা, আত্মত্যাগের কথা, সংগ্রামের কথা।

আচ্ছা ডেকে আন তাহলে শাওনকে। ঝিনুকে। আগে ডাক তোর বরকে।

তারপর এক এক করে সবাইকে ডাকবি। সবার সাথে গল্প করব। সারার কাছে যাব। শাওনের কাছে যাব।

বুঝলি শিমূল। একা একা থাকা খুব কষ্টের। ওদের কথা খুব মনে পড়ে। অনেক মনে পড়ে বলেই আর মনে করতে চাই না। বাচ্চা একটা মেয়েকে ফেলে রেখে চলে গেলাম। শাওনের জামায় ছবি এঁকে দিয়েছি কত। আর আমার মেয়েটা আমাকে ছাড়া বড় হলো। লুতফর ভাইকে জিজ্ঞেস কর, উনি এই গল্প অনেকবার করেছেন, নবাবপুরে মিষ্টির দোকানের সামনে দেখি দুটো বাচ্চা মিষ্টির ঠোঙা চাটছে, তখন রিকশা থেকে নেমে ওদের টাকা দিলাম, সেই দৃশ্যটা উনি দেখে ফেলেছিলেন। বাচ্চাদের এত ভালো লাগে আর আমার নিজের মেয়েটা....

যা যা ডাক ওদেরকে। ওরা কই। কখন আসবে। ওঠ ডাক।

২০.

শিমুল ইউসুফ ওঠেন। পাশের ঘরে তার বর নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু এখনও ঘুমিয়ে আছে। তিনি বাচ্চুকে ডাকেন।

বাচ্চু ওঠো ওঠো। ভাইয়া এসেছে।

বাচ্চু বলেন, কোন ভাইয়া?

ঝিলু ভাইয়া। আলতাফ মাহমুদ। এসো।

বলো কী। এই এগুলো তুমি কী বলছ? বাচ্চু ধরপড় করে বিছানা ছাড়েন।

এটা কি সম্ভব? বাচ্চু বলেন।

আরে আসো তো। তোমাকে ডাকছেন। শিমূল বাচ্চুকে জোর করে ধরে নিয়ে যান পাশের ঘরে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু চোখ রগড়াতে রগড়াতে পাশের ঘরে যান।

তারা এসে দেখেন কেউ নেই। থাকবার কথাও নয়।

২১.

তখন বাইরে সত্যিকারের ভোর। তখন বাইরে কাকদের কোলাহল। তখন বাইরের গলিমোড়ে জটলা বাঁধা রিকশার ধাতব ঘণ্টির অর্কেস্ট্রা।

শিমূল ইউসুফের চোখের বাঁধ ভেঙে যায় জলের প্লাবনে। তিনি শিশুর মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন, ঝিলু ভাইয়া এসে চলে গেল, শাওন আর ঝিনু আপুর সঙ্গে যে দেখাই হলো না!

এই উপাখ্যান রচনার সময় দুই হাতে উদারভাবে গ্রহণ করা হয়েছে নিচের বইগুলো থেকে:

১. আলতাফ মাহমুদ, রচনা হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, প্রকাশক বাংলা একাডেমী (১৯৮২)

২. আলতাফ মাহমুদ এক ঝড়ের পাখি, সম্পাদনা: মতিউর রহমান, প্রকাশক ঐতিহ্য (২০০৫)

৩. আলতাফ মাহমুদ, রক্ত দিয়ে লিখে গেল জীবনের গান, রচনা: আসাদুল হক, প্রকাশক সাহিত্যপ্রকাশ (২০০৭)